চতুর্থ অধ্যায়

উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নাটকে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার

নাটকের বাস্তবতা এবং জীবনের যথার্থ প্রতিফলনের তাগিদ থেকে যখন উপভাষী চরিত্রের আগমন ঘটে, তখন নাট্যকার সেই চরিত্রগুলিকে জীবন্ত মানুষরূপে তুলে ধরবার জন্য তাদের সংলাপে উপভাষার প্রয়োগ করে থাকেন। অর্থাৎ নাট্যকার তাঁর অঞ্চলের (Local) -এর বিশিষ্ট আঞ্চলিক উপভাষাটিকেই ব্যবহার করেন। এর ফল স্বরূপ লক্ষ করা যায় এই আঞ্চলিক সংলাপের মধ্য দিয়েই চরিত্রগুলি নাটকে বেঁচে থাকে। তাই আঞ্চলিক উপভাষার বিষয়ে যথার্থ মন্তব্য করে জার্মান দার্শনিক ম্যাক্সমূলার বলেছেন যে, উপভাষাই আসলে জ্যান্ত ভাষা। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ধারায় মূলত গণনাট্যের নাটক থেকেই উপভাষী চরিত্রের সংলাপে আঞ্চলিক উপভাষা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে রিয়ালিজমের অধিকার এবং নায়কত্বের পূর্ণ দাবি নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে পবিত্র সরকার— তাঁর 'নাটমঞ্চ নাট্যরূপ' গ্রন্থে যে যুক্তিসঙ্গত মন্তব্য করেছেন তা এখানে প্রণিধানযোগ্য— ''বস্তুতপক্ষে ইতিহাসের সূক্ষ্ম পরম্পরার হিসেব করলে উপভাষা-নির্ভর বাস্তবতা মধুসূদনের 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৫৯) বা দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' থেকেই প্রধানভাবে আরম্ভ হয়েছে বলা যায়। পরে এই শতাব্দীতে গণনাট্যের নাটক থেকেই এই উপভাষিক বাস্তবতার ধারাটি আরও অনেক সমৃদ্ধ হয়েছে।''[১] উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ঐতিহ্যবাহী নাট্যচর্চার ধারা বেয়ে বিশ শতকের ষাটের দশক থেকে গ্রুপ থিয়েটার ফর্মে মঞ্চায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়। এবং এই গ্রুপ-থিয়েটারের মাধ্যমে জেলাদ্বয়ের নাট্যকারগণ তাঁদের রচিত নাটকের চরিত্রগুলি বাস্তব ও জীবন্ত করে তোলবার প্রয়াসে জেলার বিশিষ্ট আঞ্চলিক ভাষায় সংলাপ ব্যবহার করে নাট্যরূপায়ণ শুরু করেন। তাই এই অধ্যায়ে দিনাজপুর জেলায় (উত্তর ও দক্ষিণ) প্রাপ্ত নাটকে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার ও তার প্রায়োগিক বৈশিষ্ট্য যথাসাধ্যরূপে তুলে ধরার প্রয়াস করছি।

দিনাজপুর জেলা প্রাপ্ত (উত্তর ও দক্ষিণ) নাটকে ব্যবহৃত আঞ্চলিক ভাষা ও তার প্রয়োগিক বৈশিষ্ট্য:

অখণ্ড বা বৃহত্তর দিনাজপুর জেলা উত্তরবঙ্গের একটি গুরুত্বপূর্ণ জেলা। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট দেশবিভাগের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের বিষয়কে কেন্দ্র করে লক্ষ করা যায় যে, র‍্যাডক্লিফ বোয়েদাদ বিভক্তিকরনের সীমারেখা নির্ধারণের নীতি অনুযায়ী বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার মোট— ৩০টি থানার মধ্যে বালুরঘাট মহকুমার অধীনভুক্ত আটটি থানার মধ্যে সাড়ে চারটি থানা এবং সদর মহকুমার দিনাজপুরের ছটি থানা মিলে মোট দশটি থানার সমন্বয়ে

গঠিত হয় নতুন পশ্চিম দিনাজপুর জেলা। আর সেই সঙ্গে সমগ্র ঠাকুর গাঁ মহকুমা, সদর মহকুমার ছটি থানা এবং বালুর ঘাট মহকুমার সাড়ে তিনটি থানা নিয়ে অর্থাৎ মোট কুড়িটি থানা মিলে পূর্বদিনাজপুর জেলা গড়ে ওঠে। মোটকথা, দিনাজপুরের পশ্চিমাংশের এক-তৃতীয়াংশ হয়েছে ভারতভুক্ত এবং উত্তর ও পূর্বাংশের দুই-তৃতীয়াংশ পূর্ব পাকিস্তান (অধুনা বাংলাদেশ) ভুক্ত হয়েছে। দিনাজপুর জেলার ভারতভুক্ত অংশ পশ্চিমবঙ্গের অধীনে একটি নতুন জেলা রূপে পশ্চিম দিনাজপুর নামে চিহ্নিত হয়। এই অদ্ভুত ধরনের দেশ বিভাগের ফলস্বরূপ অবশেষে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনকালে ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে ভাষা কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী বিহার রাজ্যের পূর্ণিয়া জেলার একফালি জমি সংযোগ-পথ হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বিযুক্ত হয়ে নতুন ইসলামপুর মহকুমা গড়ে ওঠে এবং ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে পূর্ণিয়া জেলার চারটি থানার সমন্বয়ে নতুন তৈরি ইসলামপুর মহকুমা দার্জিলিং জেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার তৃতীয় মহকুমা হিসেবে পরিগণিত হয়ে পশ্চিমদিনাজপুর জেলার আয়তন বর্ধিত হয়।

রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কারণে জেলা বিভাজনের পালা এখানে থেমে না থেকে পুনরায় ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের ১লা এপ্রিল দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে দক্ষিণ ও উত্তর এই নামে পশ্চিমদিনাজপুর জেলা বিভক্ত হয়। এই পশ্চিম দিনাজপুর জেলার— দক্ষিণ-পূর্বাংশের আটটি থানা, যথা— হিলি, বালুরঘাট, কুমারগঞ্জ, গঙ্গারামপুর, তপন, বংশীহারী, হরিরামপুর ও কুশমণ্ডি যুক্ত হয়ে গঠিত হয় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা। আবার ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে গঙ্গারামপুর বংশীহারী, হরিরামপুর ও কুশমণ্ডি থানা নিয়ে গঙ্গারামপুর মহকুমা গঠিত হয়েছে। আর তার উত্তর-পশ্চিমাংশের নয়টি থানা, যথা— রায়গঞ্জ, হেমতাবাদ, কালিয়াগঞ্জ, ইটাহার করণদীঘি, ইসলামপুর, চোপড়া, গোয়ালপোখর-১, এবং গোয়ালপোখর-২, (চাকুলিয়া) যুক্ত হয়ে উত্তরদিনাজপুর জেলা গঠিত হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, দক্ষিণ দিনাজপুর ও উত্তর দিনাজপুর জেলার মূলভাষা বাংলা হলেও এই বাংলা ভাষা বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের কথ্য ও লেখ্যরূপে ব্যবহৃত চলিত বা শিষ্ট বাংলা ভাষার মতো নয় বরং এই জেলাদ্বয়ে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী অধিকাংশই একটি কথ্য বাংলা বা আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করে থাকেন। এই আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারকারীদের মধ্যে একটি বৃহত্তর জনগোষ্ঠী তথা প্রধান অধিবাসী রাজবংশী সমাজ। এর সঙ্গে রয়েছে বিপুল সংখ্যক মুসলমান জনসমাজ। এখানকার জনসমাজের অঙ্গ হিসাবে বর্ণহিন্দুরা অবস্থান করলেও গ্রামাঞ্চলে তারা কম বসবাস করেন। এছাড়াও এতদ্ অঞ্চলে রয়েছে উপজাতি জনসমাজ— মুণ্ডা, ওরাওঁ, সাঁওতাল, করমালি, কোরা, লোধা, মাহালি, মালপাহাড়ি প্রভৃতি। সেই সঙ্গে হিন্দি ভাষী লোকেরাও এ জেলাদ্বয়ে বসবাস করছেন। মোটকথা অখণ্ড পশ্চিম দিনাজপুর জেলার তপশিলী জাতি, উপজাতি, বর্ণহিন্দু ও মুসলমান

জনগোষ্ঠী এক বৃহৎ সংখ্যক মানুষের একমাত্র বাক্‌মাধ্যম হল এই কথ্য বাংলাটি, যা জাতি, ধর্ম, গোষ্ঠী নির্বিশেষে প্রচলিত ও আপন স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত। এমনকি এ জেলার ভিন্নভাষী জনগোষ্ঠীর মানুষেরা নিজেদের পরিবার, পরিজন ও সমাজে ভিন্ন ভাষা ব্যবহার করলেও তারা বাইরে সংযোগকারী ভাষারূপে এই কথ্যবাংলাকে অনুসরণ করে থাকেন। তাই এই দ্বিভাষিক (Bilin-gual) জনসাধারণের কাছেও এই উপভাষার যথেষ্ট গুরুত্ব লক্ষ করা যায়।

আমার গবেষণার অঞ্চল দিনাজপুর জেলা। তাই আমি দিনাজপুর জেলার আঞ্চলিক ভাষার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোকপাত করছি। সারা পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বাংলা ভাষী মানুষেরা জেলার একটি উপভাষাতেই কথা বললেও অঞ্চলগত ব্যবধানের জন্য ধ্বনি উচ্চারণে এবং শব্দ ব্যবহারে কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় জন্য ভাষাগত দিক থেকে এই জেলাকে প্রধানত দুটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়— দক্ষিণ অঞ্চল এবং উত্তর অঞ্চল।

অখণ্ড পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ভাষাগত অঞ্চল রূপে দক্ষিণ অঞ্চলের সীমানা নির্দেশ করতে গিয়ে ড. সুভাষ রায়চৌধুরী তাঁর গবেষণামূলক গ্রন্থ 'পশ্চিম দিনাজপুর জেলার উপভাষা' নামে যে সীমানা উল্লেখ করেছেন তা এখানে প্রাণিধান যোগ্য— ''দক্ষিণ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হল সমগ্র বালুরঘাট মহকুমা এবং রায়গঞ্জ মহকুমার পূর্বাংশ। বালুরঘাট মহকুমার অন্তর্গত ক্রমশ দক্ষিণ দিক থেকে হিলি থানা, বালুরঘাট থানা, কুমারগঞ্জ থানা, তপন থানা এবং গঙ্গারামপুর থানা এই অঞ্চলে পড়ে। এছাড়া এর মধ্যে রয়েছে রায়গঞ্জ মহকুমার ক্রমশ দক্ষিণ থেকে বংশীহারী থানা, কুশমন্ডি থানা, কালিয়াগঞ্জ থানা, ইটাহার থানা এবং রায়গঞ্জ থানার পূর্বাংশ এবং সমগ্র হেমতাবাদ থানা। রায়গঞ্জ থানার পূর্বাংশ বলতে প্রধানত ৩৪ নং জাতীয় সড়কের পূর্ব দিকের সমস্ত গ্রামগুলি যেমন— দক্ষিণে দুর্গাপুর, ভ্যাণ্ডাবাড়ি, গোয়ালপাড়া, তাহেরপুর, বামুন গাঁ, বরুয়া, কাশীবাটী, কর্ণজোড়া হয়ে আরও উত্তরে হেমতাবাদ থানার অন্তর্গত বাংলাদেশ সীমানা বরাবর মালন, বিষ্ণুপুর, ভানৈল, দরিমানপুর প্রভৃতি গ্রামগুলি পর্যন্ত ভাষাগত দক্ষিণ অঞ্চল বিস্তৃত।

এই অঞ্চলটির পূর্ব পার্শ্বে রয়েছে দিনাজপুর এবং তৎসংলগ্ন রংপুর, দক্ষিণ পূর্বে বগুড়া ও রাজসাহী এবং মালদহ অর্থাৎ বরেন্দ্রী উপভাষা অঞ্চল। ফলত এই ভৌগোলিক নৈকট্যের জন্য বরেন্দ্রী উপভাষার সহিত কিছু সাদৃশ্য পশ্চিম দিনাজপুর জেলার দক্ষিণ অঞ্চলের উপভাষায় অনুভব করা যায়।"

আবার তিনি ভাষাগত উত্তর অঞ্চলের সীমানা উল্লেখ করেছেন এই ভাবে— ''ভাষাগত উত্তর অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হল রায়গঞ্জ থানার পশ্চিমাংশ এবং ইসলামপুর মহকুমার অধীন সমস্ত থানাগুলি।

রায়গঞ্জ থানার পশ্চিমাংশ বলতে বোঝানো হচ্ছে ৩৪ নং জাতীয় সড়কের পশ্চিম পার্শ্বস্থ গ্রামগুলি— যেগুলি নাগর নদী ও কুলিক নদীর তীরবর্তী তথা বিহারের নিকটবর্তী। যেমন— ক্রমশ দক্ষিণ থেকে গ্রামগুলির নাম— বিষাহার, অভোর, গৌরী, সুরুন, শ্যামপুর, হাতিয়া, ভিটিয়ার, টেঘ্‌রা, শংকরপুর, ঝিউকা, বাহিন, নারায়ণপুর, পানিশালা প্রভৃতি।

এছাড়া এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হবে নাগর নদী পার হয়ে ক্রমশ উত্তর-দিকে যেতে সমস্ত করণদীঘি থানা, গোয়ালপোখর থানা— (এক নং ও দুই নং), ইসলামপুর থানা এবং চোপড়া থানার অন্তর্গত সমস্ত স্থানগুলি।

এই অঞ্চলটি পশ্চিমাংশে প্রধানত বিহার রাজ্যের পূর্ণিয়া জেলা সংলগ্ন। বর্তমানে পূর্ণিয়া ও কাটিহার জেলা পৃথক হওয়ায় রায়গঞ্জ এবং করণদীঘি থানার পশ্চিমাংশে সন্নিহিত হল কাটিহার জেলা এবং ডালখোলা থেকে আরও উত্তরে ইসলামপুর হয়ে সোনাপুর পর্যন্ত পশ্চিমে সংলগ্ন অংশ হল পূর্ণিয়া জেলা। আর সোনাপুরের কাছে শেষ উত্তর প্রান্তে দার্জিলিং জেলার সংযোগ রয়েছে।

ভৌগোলিক সংস্থানের দিক থেকে বিহার সীমান্তের নৈকট্যের জন্য পশ্চিম দিনাজপুর জেলার উত্তর অঞ্চলের উপভাষায় হিন্দি, ভোজপুরী ও মৈথিলী ভাষার কিছু শব্দগত উপাদান ও উচ্চারণগত প্রভাব অনুভূত হয়।"[২] সুতরাং ড. সুভাষ রায়চৌধুরীর মতানুযায়ী বলা যায় যে, দিনাজপুর জেলার দক্ষিণাঞ্চলে বরেন্দ্রী উপভাষার অন্তর্ভুক্ত ছিল। দিনাজপুরের উপভাষা সম্বন্ধে দেবাশীষ ভৌমিক তাঁর 'উপভাষা : মিশ্রণ ও বিলুপ্তি' গ্রন্থে বলেছেন— ''সুনির্দিষ্ট ঔপভাষিক বিভাজনের ভিত্তিতে দিনাজুপর জেলার উপভাষা 'কামরূপী' উপভাষার এলাকাভুক্ত হয়েছে।"[৩] উপরে উক্ত মন্তব্যের নিরিখে একথা বলা যায় যে, দিনাজপুরের উপভাষায় বরেন্দ্রী ও রাজবংশী আঞ্চলিক ভাষার সংমিশ্রণ লক্ষ করা যায়।

আবার সুভাষ রায়চোধুরী তাঁর 'পশ্চিমদিনাজপুর জেলার উপভাষা: একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা' প্রবন্ধে এ জেলার উপভাষা সম্বন্ধে একটি মূল্যবান মন্তব্য করে বলেছেন— ''ভাষার গোষ্ঠীগত পরিচয়ের দিক থেকে উত্তরবঙ্গের উপভাষা 'কামরূপী'র অঙ্গরূপেই পশ্চিম দিনাজপুরের উপভাষাকেও নির্দেশ করতে হয়, যেহেতু এই উপভাষার কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ঐ উপভাষায়ও নিহিত, যদিও এ জেলার ভৌগোলিক অবস্থিতিগত কারণে— এ জেলার উপভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রচুর... উত্তরবঙ্গের উপভাষা (কামরূপী)-র মত পশ্চিমদিনাজপুরের উপভাষারও ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ দিক হল— এর দেহে প্রাচীন বৈশিষ্ট্যর সংরক্ষণশীলতা।"[৪]

সুতরাং একথা বলা যায় যে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পশ্চিম দিনাজপুরের দক্ষিণ অঞ্চল নিয়ে গঠিত। আর দক্ষিণাঞ্চল বরেন্দ্রী উপভাষার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বরেন্দ্রী উপভাষার সঙ্গে দক্ষিণ

দিনাজপুরের উপভাষার অনেক সাদৃশ্য দেখা যায় । তাই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বরেন্দ্রী উপভাষার নিকটবর্তী। ভাষাতত্ত্ববিদ সুকুমার সেন বরেন্দ্রী সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন—''রাঢ়ী ও বরেন্দ্রী মূলতঃ একই উপভাষা ছিল। পরে একদিকে বাঙ্গালীর অপরদিকে বিহারীর প্রভাব করিয়া রাঢ়ী হইতে বরেন্দ্রী বিচ্ছিন্ন হইয়া পরিয়াছে।"[৫] প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত ও বরেন্দ্রীভুক্ত এতদ্ অঞ্চলের কথ্য বাংলা ভাষায় দুটি বিষয় যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল, তা হল— প্রথমত: দেশ বিভাগের ফলে পূর্ববঙ্গ থেকে অগণিত মানুষ এ জেলায় এসেছেন। এই প্রসঙ্গে ড. নির্মল দাশ তাঁর 'উত্তরবঙ্গের ভাষাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থে জানিয়েছেন— ''দেশবিভাগের পর বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য এলাকার মত উত্তরবঙ্গের তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান (অধুনা বাংলাদেশ) থেকে বাঙ্গালী উদ্বাস্তু (এঁদের মধ্যে বর্ণ হিন্দু এবং তপশিলি জাতি ও উপজাতিরাও বর্তমান।) আসতে থাকে, তবে উত্তরবঙ্গে উপনিবিষ্ট বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের মধ্যে সন্নিহিত রংপুর, দিনাজপুর, রাজসাহী, বগুড়া এবং পূর্ববঙ্গের ঢাকা, মৈমন-সিংহ, ফরিদপুর এলাকার লোকের সংখ্যায় বেশি।"[৬] ফলেই এখানকার প্রচলিত উপভাষার মধ্যে স্বাভাবিকভাবে পরিবর্তন দেখা যায়। এখানে রাজবংশী আঞ্চলিক ভাষা প্রধানত প্রচলিত থাকলেও বহিরাগত ব্যক্তিদের বাংলায় রাজবংশীদের পরিবর্তে বঙ্গালী ও বরেন্দ্রীর মিশ্র লক্ষণের প্রভাব অনুভূত হয়। আর দ্বিতীয়ত: মান্য চলিত বাংলার আগ্রাসন। অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক পরিস্থিতিতে দেখা যায় অনেকে রাঢ়ী উপভাষা প্রভাবিত চলিত বাংলা ব্যবহারে সচেষ্ট হন। কিন্তু অন্যদিকে স্থানীয় রাজবংশীদের সঙ্গে কথোপকথনে রাজবংশী আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের চেষ্টা করেন। এর ফলে এই অঞ্চলে প্রচলিত উপভাষায় বিভিন্নভাবে মিশ্রণ ঘটেছে। তাই এখানকার প্রচলিত উপভাষায় নানা প্রভাব পড়লেও এই অঞ্চলের উপভাষার গতিধারা সচল রয়েছে এবং নানা দিক থেকে কিছু নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য লাভে সমর্থ হয়েছে। প্রধানত রায়গঞ্জ ও ইসলামপুর মহকুমা নিয়ে উত্তর দিনাজপুর জেলা ভাষাগত দিক থেকে উত্তর অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এই জেলার মূলত রাজবংশী আঞ্চলিক ভাষা নিকটবর্তী। তুলনামূলকভাবে দক্ষিণদিনাজপুর জেলার উপভাষার চেয়ে উত্তরদিনাজপুর জেলার উপভাষার অধিক পরিমাণে বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়। তবে দক্ষিণ দিনাজপুরের উপভাষাও বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ।

১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দের ২৭ নভেম্বর কলোনিয়াল রাজধানী কলকাতার ডুমতলায় হেরাসিম লেবেডেফি লোকজ উপকরণের সঙ্গে ইউরোপীয় ধাঁচের মিলন ঘটিয়ে 'বেঙ্গলী থিয়েটার' নামে এক নাট্যশালা স্থাপন করেছিলেন। অর্থাৎ আমাদের থিয়েটার জগৎ বিদেশী প্রভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে গড়ে উঠেছিল। বিভিন্ন জনমুখী আন্দোলন এবং গণমুখী চিন্তাচেতনামূলক প্রয়াসের মধ্য দিয়ে গ্রুপথিয়েটারগুলি দেশের শিকড়ের অভিমুখে যাত্রা শুরু করার ফলে আঞ্চলিক বিষয়কেন্দ্রিক

সাধারণ লোক-জীবনের কথা নিয়ে নাটক রচনা শুরু হল এবং সেই সব নাটকের সংলাপে, শব্দ ব্যবহারে আঞ্চলিক কথ্যভাষার ব্যবহার ফুটে উঠতে শুরু করলো।

দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা শহর বালুরঘাটের সত্তরের দশকের অন্যতম গ্রুপথিয়েটার 'ত্রিতীর্থ' বাংলার নাট্য-জগতের একটি পরিচিত ও উল্লেখযোগ্য নাট্যসংস্থা। এই নাট্যসংস্থার প্রতিষ্ঠাতা কর্ণধার তথা উত্তরবঙ্গের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অন্যতম ও শ্রেষ্ঠ নট-নাট্যকার ও নাট্যনির্দেশক হরিমাধব মুখোপাধ্যায় আঞ্চলিক ভাষায় আঞ্চলিক নাটক রচনা করে উত্তরবঙ্গ সহ সমগ্র বাংলায় সমাদৃত হয়ে যথেষ্ট সাড়া ফেলে দিয়েছেন। তাঁর পরিচালিত ত্রিতীর্থ নাট্যসংস্থার অধিকাংশ নাট্য-প্রযোজনাই অভিনয় গুণে মঞ্চ সফল। শুধু তাই নয়, বক্তব্যের দিক থেকেও ত্রিতীর্থ সর্বদাই আধুনিক ও প্রগতিবাদী। তাই নাটক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ঝোঁক এবং প্রসঙ্গত আঞ্চলিক বিষয়বস্তু ও ভাষাকেন্দ্রিক নাটকে ত্রিতীর্থের নাট্য-প্রযোজনাগুলি অবশ্যই চোখে পড়ার মতো। নাটক মনস্ক তথা নাট্যভাবনায় সমৃদ্ধ তন্ময় নাট্যশিল্পী হরিমাধব মুখোপাধ্যায় নাট্যসংস্থার স্বার্থেই নাটক লিখতে শুরু করেন। তার রচিত বেশ কিছু পূর্ণাঙ্গ নাটকের মধ্য থেকে 'দেবাংশী', 'মন্ত্রশক্তি', 'খারিজ', 'পত্রশুদ্ধি', 'গণেশ গাথা' ও একাঙ্ক 'যদি এমন হতো' ইত্যাদি নাটকে এতদ অঞ্চলের গ্রামীণ সাধারণ লোক-জীবনের কথা সেই সঙ্গে উত্তরবঙ্গের বিশেষত অখণ্ড দিনাজপুরের কৃষক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটের কথা আঞ্চলিক ভাষায় উত্তরবঙ্গ তথা রাজধানী কলকাতায় মঞ্চস্থ করে সারা বাংলার দর্শক সমাজে সমাদৃত হয়ে যথেষ্ট খ্যাতি ও সু-উচ্চ প্রশংসা লাভ করেন। এই নাটকগুলির সংলাপের মধ্যে পশ্চিমদিনাজপুরের অধীনভুক্ত দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার আঞ্চলিক ভাষার নিদর্শন পেয়েছি। বাদবাকি যে নাটকগুলি পেয়েছি সেগুলি মান্যচলিত ভাষায় রচিত হয়েছে। এছাড়া তিনি জেলার আঞ্চলিক ভাষায় রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' গল্প অবলম্বনে নাট্যরূপ দিয়েছেন 'আহোত্রী'। এবং রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটক দিনাজপুরের স্থানীয় রাজবংশী ভাষায় বা আঞ্চলিক ভাষায় নাট্যরূপ দিয়েছেন এবং এই নাটক প্রথমে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরবর্তীকালে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ হয়। এছাড়াও বালুরঘাটের কৃতি সন্তান তথা উত্তরবঙ্গের প্রথিতযশা ও উল্লেখযোগ্য নাট্যকার নীহার ভট্টাচার্য দীর্ঘকাল জার্মানে বসবাস করার সুবাদে জার্মান ভাষা রপ্ত করে জার্মান নাটক বাংলায় অনুবাদ করতে শুরু করেন। তিনি জার্মান নাট্যকার ক্লাইস্টের 'Der zebrochene krug' নাটকের কাহিনী অবলম্বন করে 'ভাঙ্গাপট' নামে নাট্যরূপ দিয়েছেন। তাঁর অনূদিত এই নাটকটির ঘটনার কিছু পরিবর্তন করে পশ্চিম দিনাজপুরের আঞ্চলিক ভাষায় নীহার বাবুর অনুমতি নিয়ে ভাষান্তর করলেন তাঁর বন্ধু সত্যরঞ্জন তালুকদার। এটি অনাবিল হাস্যরসের নাটক। ত্রিতীর্থ কলকাতার কলামন্দিরে জেলার আঞ্চলিক উপভাষায় নাটকটি মঞ্চস্থ করে কলকাতার নাট্যপ্রিয় দর্শক সমাজকে

মুগ্ধ ও বিস্মিত করে দিয়েছেন। মোটকথা, নীহার ভট্টাচার্যের অনূদিত 'ভাঙ্গাপট' নাটকের মধ্যেও পশ্চিম দিনাজপুরের উপভাষার ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

উত্তর দিনাজপুর জেলার সদর শহর রায়গঞ্জে ষাটের দশকে গ্রুপথিয়েটারের প্রেরণায় যে সব নাট্যদল গড়ে উঠেছিল, তার মধ্যে অন্যতম ও বলিষ্ঠ গ্রুপ থিয়েটার হিসেবে 'ছন্দম' নাট্যসংস্থা জেলা তথা সমগ্র বাংলাজুড়ে বেশ খ্যাতি লাভ করেছিল। এই নাট্যসংস্থা নিজস্ব উদ্যোগে জেলার স্থানীয় সমস্যাকে প্রাধান্য দিয়ে গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবন কথা কখনও কখনও তাদের নিজস্ব নাটকে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের প্রচলিত আঞ্চলিক কথ্য ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন। ছন্দমের প্রতিষ্ঠালগ্নের সদস্য তথা সুঅভিনেতা, নাট্য-নির্দেশক ও নাট্যকার অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাট্যরূপ 'গোধূলী'তে উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জ অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষার সন্ধান পেয়েছি। এবং সেই সঙ্গে এই নাট্যসংস্থার অন্যতম নাট্যকর্মী সুব্রত রায়ের নাট্যরূপ 'যতীনবাবুর চাকর'-এ কুশমণ্ডিসহ 'উত্তরদিনাজপুর জেলার আঞ্চলিক ভাষার ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এছাড়াও লক্ষ করেছি উত্তরদিনাজপুরের হেমতাবাদ থানার 'রূপক শিল্পী সংস্থা'র প্রধান নাট্যকর্মী নৃপেন্দ্রনাথ মহন্ত এখানকার উপভাষায় 'ক্যানে কেন্নে' নাটক রচনা করেছেন, যাতে এতদঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষার বাস্তব রূপায়ণ পরিস্ফুটিত হয়েছে।

পূর্বের আলোচনায় আমরা অবগত হয়েছি যে, ভাষাগত অঞ্চলরূপে অখণ্ড পশ্চিম দিনাজপুর জেলাকে প্রধানত দুটি অঞ্চলে ভাগ করা যায়। দক্ষিণ অঞ্চল এবং উত্তর অঞ্চল। দক্ষিণ অঞ্চলে বালুরঘাট ও গঙ্গারামপুর এই দুটি মহকুমার পূর্বদিকে রয়েছে দিনাজপুর এবং তৎসংলগ্ন রংপুর, দক্ষিণ-পূর্বে বগুড়া, রাজশাহী এবং মালদহ জেলা। এই অঞ্চলগুলি মূলত বরেন্দ্রী উপভাষা অঞ্চল হওয়ার সুবাদে ভৌগোলিক নৈকট্যের জন্য বালুরঘাট ও গঙ্গারামপুর এই দুটি মহকুমা এবং উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জ, ইটাহার, হেমতাবাদ এবং রাজগঞ্জ থানার পূর্বাংশের ভাষাগত দক্ষিণ অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা বরেন্দ্রীর কিছু সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

ভাষাগত দক্ষিণ অঞ্চলের এই বিস্তীর্ণ এলাকায় সবসময় আদ্য 'র' স্থলে 'অ' উচ্চারণ হয় এবং আদ্য 'অ' কখনো কখনো 'র'-তে পরিণত হয়। উদাহরণ: আদ্য র > অ : রং > অং, রাজা > আজা, রাইত > আইত আবার আদ্য অ > র : আয়না > রায়না, অংশ > রংশ, আইন > রাইন। এছাড়া ক্রিয়াপদান্তে 'ছ' এর উচ্চারণ অনেকটা 'স'-এর মতো। উদাহরণ— ছ > স্ : করছিল > করিস্‌ল, করিছে > করিসে, ধরিছে > ধোইসে। আবার দন্ত্য 'স'- 'শ' রূপে উচ্চারিত হতে দেখা যায় এবং আদ্য 'ল' প্রায় সর্বদায় 'ন' রূপে উচ্চারিত হয়। উদাহরণ— লতা > নতা, লাল > নাল, লাভ > নাভ, লবন > নবন। কখনো কখনো আদ্য 'ই' ও 'উ'-এর সঙ্গে একটি অতিরিক্ত 'ন'-এর আগম হতে

দেখা যায়। উদাহরণ— ইটাহার > নিটাহার, উকুন > নুকুন/নুকনি, ইন্দুর > নিন্দুর।

ভাষাগতভাবে বিভক্ত দক্ষিণ অঞ্চলের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সর্বনাম পদগুলি মূলত— মুই, হাম্‌রা, তুই, তোম্‌হা, তোম্‌হারা, অয়, ওয়া, তম্‌হা, ওম্‌রা ইত্যাদি ব্যবহার হয়।[৭]

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ও গঙ্গারামপুর মহকুমার লোকমুখে ব্যবহৃত কথ্যভাষাকে আবার কোটিবর্ষীয় লোকভাষা নামে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পূর্ব অঞ্চলের অধিবাসীদের আটপৌরে কথ্য ভাষাই কোটিবর্ষীয় লোকভাষা নামে পরিচিত। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট সদর শহরের অন্যতম ত্রিতীর্থ নাট্যসংস্থার অন্যতম প্রথিতযশা নাট্যকার হরিমাধব মুখোপাধ্যায় ভাষাগত দক্ষিণ অঞ্চলের বরেন্দ্রী উপভাষায় 'দেবাংশী', মন্ত্রশক্তি, খারিজ, পত্রশুদ্ধি, গণেশ গাথা ইত্যাদি নাটকগুলির নাট্যরূপ দিয়ে যথেষ্ট সার্থকতার সঙ্গে মঞ্চস্থ করেছেন।

ভাষাগত অঞ্চলরূপে উত্তর অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে রায়গঞ্জ থানার পশ্চিমাংশ এবং ইসলামপুর মহকুমা। রায়গঞ্জ থানার পশ্চিম পার্শ্বস্থ গ্রামগুলি, যেগুলি নাগর ও কুলিক নদীর তীরে এবং বিহারের সীমান্তবর্তী অঞ্চলের অধীনে রয়েছে। সেই সঙ্গে রয়েছে নাগর নদী পার হয়ে উত্তর দিকে করণদীঘি এবং গোয়ালপোখর থানা ১নং ও ২নং ইসলামপুর এবং চোপড়া থানার অধীনে অবস্থিত সমস্ত গ্রামগুলি, এই বৃহত্তর ভূখণ্ড ভাষাগতভাবে উত্তর অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আরও জানা যায় যে, এই অঞ্চলটি বিহার রাজ্যের পূর্ণিয়া জেলার লাগোয়া এবং সোনাপুরের কাছে শেষ উত্তর প্রান্তে রয়েছে দার্জিলিং জেলার সংযোগস্থল। তাই এই অঞ্চল ভৌগোলিকভাবে বিহার সীমান্তের কাছাকাছি হওয়ার জন্য উত্তর-অঞ্চলের উপভাষায় হিন্দি, ভোজপুরী এবং মৈথিলী ভাষার প্রভাব রয়েছে।

উত্তর অঞ্চলের এই বিস্তীর্ণ এলাকায় আদ্য 'র' সর্বদা অবিকৃত থাকে এবং এর কোনো পরিবর্তন হয় না। আদ্য 'ন'-এর অনেক সময় 'ল'-এর মতো উচ্চারণ হয়। তাছাড়া আদ্য ও অন্ত্য 'শ' কখনো কখনো 'স'-এর মতো, এবং কখনো কখনো 'ছ'-এর মতো উচ্চারিত হয়। আবার পদমধ্যবর্তী 'ল' এবং অন্ত্য 'ল' অনেক সময় 'র'-এর মতো উচ্চারণ হয়। কখনো কখনো শ্রুতিধ্বনির মতো 'হ' ধ্বনির আগমও পরিলক্ষিত হয়।

উদাহরণ— আদ্য 'ন'-র ব্যবহার —

ন > ল: নদী > লদী,
নীল > লীল।

আদ্য 'শ' ও অন্ত্য 'শ'-এর ব্যবহার —

শ > স: শালা > সালা,

বিশ > বিস,

ত্রিশ > ত্রিস, তিস্।

স > ছ: সাহস > ছাহস,

সস্তা > ছচতা।

ল > র: শালি > সারি,

ঝোল > ঝোর।

'হ' ধ্বনি আগম : কামার > কামহার,

কুমার > কুমহার,

শাস্তি > সাহাস্তি।

অন্ত্যে 'হ' ধ্বনির আগম— বুড়া > বুড়হা,

বুড়ি > বড়হি,

কড়া > কাড়হা।

উত্তর অঞ্চলের প্রধান সর্বনাম শব্দগুলি— মুই, হামি, হাম্‌রা, তুই, তুম্‌হা, তুম্‌মা, অয়, উস্‌মা, ওস্‌মা ইত্যাদি ব্যবহার হয়। এছাড়াও এই বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগে শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আরবি, ফারসী এবং হিন্দি শব্দের অধিকতর প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। যেমন—

জল > পানি,

ডিমা > ডিমা বা বৈদা,

ঘাড় > গর্দন।

এছাড়া বহুল প্রচলিত শব্দগুলি হল— নিক্‌লা, বখিল, দুশমন, দোস্ত, মেজ্‌বান, বেওয়া, হাতিয়ার, মুলুক, বেটা, বেটি, চেল্‌হা, হেকিম হুশিয়ার ইত্যাদি।[৮]

উত্তর অঞ্চলের সমগ্র লোকবৃত্ত সমাজের এক বৃহত্তম জনগোষ্ঠী রাজবংশী সমাজ। রায়গঞ্জের গ্রামাঞ্চলের প্রধান অধিবাসী। রায়গঞ্জ মহকুমার অধীনে বসবাসকারী তপশিলী জাতি, উপজাতি, বর্ণহিন্দু ও মুসলমান জনগোষ্ঠীর এক বৃহৎ সংখ্যক মানুষের একমাত্র বাক্‌মাধ্যম প্রচলিত যে বাংলা ভাষা তার আঞ্চলিক নাম রাজবংশী ভাষা, এই ভাষারই অন্তর্গত। যা রায়গঞ্জ মহকুমায় দেশিপলি রাজবংশী আঞ্চলিক ভাষা নামে পরিচিত। এমনকি এই কথ্য বাংলাটিই এতদঞ্চলের বৃহৎসংখ্যক মানুষের একমাত্র বাকমাধ্যম। এই বিষয়ে প্রাসঙ্গিক মন্তব্য করে ড. নির্মল দাশ বলেছেন— ''কোনো এলাকার জনবিন্যাসের ধরণই সেই এলাকার বাচকগোষ্ঠীর পরিচয় নির্ধারণ করতে সাহায্য করে।''[৯]

উত্তর দিনাজপুরের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল ইসলামপুর মহকুমা। পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে

যে, ভাষাগত উত্তর অঞ্চলের অধীনে রায়গঞ্জ থানার পশ্চিমাংশ থেকে শুরু করে ইসলামপুর মহকুমার সমস্ত ব্লকের অধীনে যে সমস্ত গ্রাম রয়েছে, সেখানে জাতিগত বৈশিষ্ট্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে হিন্দিভাষী বিহার অঞ্চলের প্রভাব লক্ষ করা যায়। এই ভাষাগত উত্তর অঞ্চলের সাধারণভাবে প্রচলিত লোকভাষা আবার 'কাইথী বাংলা' নামেও পরিচিত হয়েছে। আবার অনেকেই ইসলামপুর মহকুমার উপভাষাকে 'সূর্যাপুর' গ্রামের নামানুসারে 'সূর্যাপুরী' আমের মতো 'সূর্যাপুরী লোকভাষা' নামে অভিহিত করেছেন। এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, উত্তরদিনাজপুর জেলার ইসলামপুর মহকুমায় স্থানীয় বিষয় নিয়ে আঞ্চলিক ভাষায় মৌলিক নাটক (প্রসেনিয়াম ফর্মে বা আঙ্গিকে) রচিত না হওয়ায় এতদ্ অঞ্চলের আঞ্চলিক উপভাষায় কোন নিদর্শন পাওয়া যায়নি। পরিশেষে একথা বলা যায় যে, ভাষার গোষ্ঠীগত পরিচয়ের দিক থেকে উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক ভাষা রাজবংশীর ভাষার অঙ্গরূপেই দক্ষিণ দিনাজপুর এবং উত্তর দিনাজপুর জেলার উপভাষাকেও নির্দেশ করতে হয়। এছাড়াও এই দুই জেলার ভাষাগত দুটি অঞ্চলের মধ্যে বিশেষত দক্ষিণ অঞ্চল দিনাজপুর এবং তৎসংলগ্ন রংপুর, দক্ষিণ পূর্বে বগুড়া, রাজশাহী ও মালদহ জেলা অবস্থান করায় ভৌগোলিক নৈকট্যের সুবাদে এই অঞ্চলের লোকবৃত্ত সমাজে বরেন্দ্রী উপভাষার কিছু কিছু সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলা যায় যে, উত্তরবঙ্গের উপভাষা কামরূপী বা বরেন্দ্রী যাই হোক না কেন দক্ষিণ দিনাজপুর ও উত্তর দিনাজপুর জেলার উপভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য যেমন রয়েছে ঠিক তেমনিভাবে ঐতিহাসিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে, এই জেলা দ্বয়ের উপভাষায় প্রাচীন বৈশিষ্ট্যের সংরক্ষণশীলতাও রয়েছে।

দক্ষিণ দিনাজপুর ও উত্তর দিনাজপুর জেলায় প্রাপ্ত নাটকগুলির মূল পাঠ্যাংশের সংলাপ বা কথোপকথন ও শব্দ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে দুই জেলায় প্রচলিত বরেন্দ্রী বা রাজবংশী যে ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি (দৃষ্টান্ত) খুঁজে পেয়েছি, সেগুলি ভাষাবিজ্ঞানের প্রধান আলোচ্য বিষয় ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের নিরিখে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। আমি আলোচনার সুবিধার্থে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের বরেন্দ্রী উপভাষায় দেওয়া নাট্যরূপ 'দেবাংশী', 'মন্দ্রশক্তি, নাটক দুটি এবং উত্তর দিনাজপুর জেলার অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কামরূপী বা রাজবংশী উপভাষায় নাট্যরূপ 'গোধূলী' বেছে নিয়েছি।

অভিজিৎ সেনের মূল গল্প অবলম্বনে এ জেলার তথা পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম ও খ্যাতনামা নাট্যকার হরিমাধব মুখোপাধ্যায় নাট্যরূপ দিয়েছেন 'দেবাংশী'। এই নাটকের পটভূমি পশ্চিম দিনাজপুর জেলার একটি প্রত্যন্ত গ্রাম এবং এই গ্রামের সাধারণ মানুষদের জীবন-যাপন পুরোপুরি রূপে লৌকিক বিশ্বাসের উপর প্রবহমান। তাই এই নাটকের কেন্দ্রিয় চরিত্র এমন একটি মানুষ যার মধ্যে দেবত্বের ছায়া দেখতে পেয়ে গ্রামবাসী তাকে দেবাংশী বা দেবতার অংশ বলে বিশ্বাস করে

এবং গ্রামের রোগ-শোক, ব্যথা-বেদনা, জরা-ব্যধি ও দুঃখ-দুর্দশায় জর্জরিত মানুষ তাকে ক্রমে দেবত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে তার কাছে বিধান প্রার্থনা করে। গ্রামের সাধারণ অসহায় গরীব মানুষদের বিশ্বাস দেবাংশী মুখ দিয়ে (মা বিষহরি দেবী ভর করলে) যা বলে তাই সত্য। অর্থাৎ তার মুখের কথাতেই গ্রামবাসী তুষ্ট হয়। এর ফলে গ্রামের সকল মানুষ এই শান্ত, নিয়মনিষ্ঠ দেবাংশীকে নিষ্ঠাসহ নিয়ম নীতি মেনে দেবতাজ্ঞানে পূজা করে। শেষ পর্যন্ত কাহিনীর পরিণতিতে দেখা যায়, নানা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দেবাংশী সমস্ত সংস্কার, দ্বিধা ঘুচিয়ে দেবতার আসন থেকে সাধারণ মানুষের পর্যায়ে নেমে এসে নিজেকে গ্রামের সাধারণ কৃষিজীবি চাষী পরিবারের মানুষ বলে পরিচয় দেয়।

'দেবাংশী' নাটকের সংলাপ কাহিনীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আঞ্চলিক উপভাষার বিন্যাসে গড়ে উঠেছে। সমগ্র উত্তরবঙ্গের বিশেষ করে দক্ষিণ দিনাজপুরের লোকমুখে ব্যবহৃত কথ্য ভাষা মূলত বরেন্দ্রী উপভাষায় নাট্যকার হরিমাধব মুখোপাধ্যায় এই নাটকের নাট্যরূপ দিয়েছেন। এর ফলে নাটকের সংলাপ এই নাটককে বিশ্বাসযোগ্য ও মাটির কাছাকাছি করে তুলেছে। অর্থাৎ এতদ অঞ্চলের গোটা গ্রাম, গ্রাম্য-জীবন, সংস্কার ও প্রকৃতি সব কিছু শুধুমাত্র আঞ্চলিক সংলাপের গুণে এই নাটকে প্রাণবন্ত ও বাস্তবধর্মী হয়ে উঠেছে। হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'ত্রিতীর্থ' এই দেবাংশী নাটকটি কলকাতার বাতানুকূল 'বিদ্যামন্দির' মঞ্চে ১ম ও ২য় মার্চ ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে ক্যাপস্ট্যান ফ্লেভার সিলেকশন্‌জ্‌ ও সীগাল এমপায়ায়ের পরিবেশনায় কলকাতায় প্রথম মঞ্চস্থ করে দর্শক সমাজকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করে ভূয়সী প্রশংসা লাভ করে। এমনকি, ত্রিতীর্থ প্রযোজিত ও হরিমাধব মুখোপাধ্যায় নির্দেশিত 'দেবাংশী' নাটকের শো হয়েছে শত রজনীর উর্দ্ধে। এই নাটক কলকাতার 'বিদ্যামন্দির' মঞ্চে দেখে উত্তরবঙ্গের অবিভক্ত দিনাজপুর তথা সমগ্র বাংলার নাট্যজগতের অসামান্য ও খ্যাতনামী অভিনেত্রী ও নাট্যকার তৃপ্তি মিত্র তাঁর প্রতিক্রিয়া— ত্রিতীর্থ' গ্রুপ থিয়েটার সংস্থার কর্ণধার তথা এ জেলার স্বনামধন্য নাট্যকার হরিমাধব মুখোপাধ্যায়কে জানিয়েছেন—

''শ্রী হরিমাধব মুখোপাধ্যায় সমীপেষু—

ভাই, চিঠি পেলে আমি বিরক্ত হইনা। তায় তোমার মত লোকের চিঠি।

সেদিন দেবাংশী নাটকটি আমার খুবই ভালো লেগেছিল। প্রযোজনা পরিচালনা অভিনয় সব। যিনি দেবাংশীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন তাঁর কথা কি বলব, অতি সুন্দর। তুমি নিজেও খুবই ভাল। সকলেই ভাল। আর এই সকলেই যখন নিবিষ্ট হয়ে অভিনয় করে— তখনই না নাটক জমে ওঠে। নাটকটিও আমার খুব ভাল লেগেছে। দু একটা ত্রুটির কথা হয়তো মনে হয়েছে সে থাক।

আর কি নতুন করছ? কলকাতায় কবে আসছ? হ্যাঁ নিজের দেশের ভাষা শুনে খুবই ভাল লাগছিল। তোমাদের ভাল হোক মঙ্গল হোক এই কামনা করি।"

'দেবাংশী' নাটকে নাট্যকার হরিমাধব মুখোপাধ্যায় পশ্চিম দিনাজপুর জেলার অধীনভুক্ত দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সাধারণ গ্রাম্য মানুষদের ধর্মীয় বিশ্বাস তথা লৌকিক আচার, আচরণ এবং সেই সঙ্গে সমকালীন সমাজ ব্যবস্থার পূজা-পার্বণ, সংস্কার, প্রথা সম্বন্ধীয় জীবন কথা তুলে ধরতে গিয়ে প্রাসঙ্গিকভাবে জেলার ব্যবহৃত কথ্য ভাষার প্রধানত বরেন্দ্রী উপভাষার ব্যবস্থার সুস্পষ্ট রূপে ফুটে উঠেছে। এই নাটকের কাহিনীর শুরুর (১ম দৃশ্য, পৃ. নং. ১-৩) সংলাপ বা কথোপকথনের মধ্যে এই আঞ্চলিক উপভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি পাওয়া যাচ্ছে, তাই উদাহরণ স্বরূপ কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল—

''খেরা খেলার স্থান। শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তি বিষহরির থানের সামনে গোবর লেপা খেরার চৌহদ্দি। মাঝখানে একটা নিটোল কাঁচা কলা গাছের গুড়ি। মাটির মধ্যে বসানো। চারপাশে কাঁচা বাঁশের খুটি। লাল সুতায় আমপাতার ঝালর। কলাগাছের সামনে ফুল পল্লবে সজ্জিত ঘট। মাটির খরায় ধূপ। সিঁদুর, কালো কচুর গাছ। পাটের চারা গাছ। দুদিকে দুজন ঢাকী উদ্দাম লয়ে ঢাক বাজাচ্ছে। সঙ্গে কাঁশি। জনতা ভিড় করে আসে চারপাশে। থানের চৌহদ্দির মধ্যে কয়েকজন মানুষ হাত উঠাচ্ছে নামাচ্ছে। দুজন গুণমান সামসের এবং বিরাম দুদিকে চেলাসহ বসে গাঁজায় দম দিচ্ছে। হঠাৎ দশ বছরের বালক সারবান খেরা খেলায় চৌহদ্দির মধ্যে ঢুকে পড়ে। প্রথমে ব্যাপারটা কেউ খেয়াল করে না। পরে কয়েকজনের নজরে পড়ে। তার মধ্যে নগেন চেঁচিয়ে ওঠে।

গোষ্ঠ : আরি এই চ্যাংড়া, এই গিদরা তুই এটে ঢুকলু ক্যামকা করে রে। বাড়া, বাড়া, মরবু না কি রে।

শম্ভু : ছাড়ি দে ছাড়ি দে নগনা। ছোড়া পাতা হোবে। তাই চুরি পড়িছে হাতে।

গোষ্ঠ : কি কছুরে। এতটুনি ছোড়া, নাকোত পোটা পড়োছে, অঁয় হোবে পাতা। মুখেত অক্ত উঠে মরি যাবে। এই চ্যাংড়া বাড়া, বাড়া থানত্থে।

ব্রজেন : বারে কি হল গোষ্ঠ ওঠে। চ্যাচাছিস কেনে?

গোষ্ঠ : দেখ দিনি ভাই, চ্যাংড়ার সাহস থানত ঢুকি পড়িছে।

ব্রজেন : হারে ছ্যাঁচাই তো। এ চ্যাংড়া এটে কোটথে আলোরে। কার বাড়ির চ্যাংড়া এটা। এই চ্যাংড়া তোর বাপের নাম কিরে? যা সংকট কথাই কয় না থি।

গোষ্ঠ : হারে এই চ্যাংড়া বাড়া বাড়া।

ঝড়ু : আরে হাত ধরে টানে বাড় করে নিয়ান নাড়ে।

গোষ্ঠ : ইড়। মোর বাসি কাপড়। মুই থানোত ঢুকমো কি করে।

ঝড়ু : হারে বৈজা তে তু টানে নিয়ান।

বৈজা : হুড়, মোর বাড়িতে অশুচ। দেখছি না খৈরী হও নাই।

ঝড়ু : কে মরিছে তোর বাড়িত।

বৈজা : মোর আজা মশাই— মাওর বাপ।

ঝড়ু : দুর, বোকদা মাওর বাপ মরিচে তে তোর অশোচ হোবে কেন?

বৈজা : ওলা মুই জান না। মোর শাপ নাগলে তুই মোক বাঁচাবু।

গোষ্ঠ : ঠিকই তো কছে অঁয়। কেন তে তুই ফটফট করছু। তুই করবা পারছু না কামটা।

ঝড়ু : মুই! আচ্ছা দেখছি। এই চ্যাংড়া। এই ছোড়া বাড়া থানথে। ... এই তোরা ডাকবা পারিছুনা।

সকলে : এই চ্যাংড়া, এই ছোড়া শুনা পাছিস।

(একটা হট্টগোল বিরাম এগিয়ে আসে)

বিরাম : কি হইছে। পূজার থানে অমকা চেচাছেন কেন?

গোষ্ঠ : দেখেন দিনি গুণমান। এই গিদরা চ্যাংড়া থানোত ঢুকে পড়িছে। মুখে অক্ত উঠে মইরবে না।

সামসের : যা সংকট, চ্যাংড়া তো মইরবে দেখছি। কার চ্যাংড়া এটা। আরে বাজন এনা থামা দিনি। এ চ্যাংড়া কার? আরে এই গিদরা, এই চ্যাংড়া ...আরে চ্যাংড়া ঠসা নাকি? এই চ্যাংড়া... (সামাসের হাত ধরে টানে বার করে দিতে চায়।)

বিরাম : দাড়ান! গুণমান। চ্যাংড়ার এনা দেখপা দেও। চ্যাংড়াক চোখেত ভাষা নাই। রোম চুল সব খাড়া হয়া গেইছে। থাক, এই চ্যাংড়া থানত। ইবার আসল গুণমানি বুঝা যাবে।

সামসের: তুমি এলা কি করেন বিরাম ভাই? চ্যাংড়াক নিয়ে খেলা কইরবা চান।

বিরাম : অঘটন!

সামসের: ই ই অঘটন! জিবিলি না হোলে অঁর গলা তে অক্ত উঠবার পারে। চাই কি জীবনও যাবার পারে। ইসব নিয়া চালাকি করা ঠিক নয় গুণমান।

বিরাম : সেলাম গুণমান। সেলাম দশজন। যদি সামসের গুণমানের মন্তরে ই চ্যাংড়ার মুখত অক্ত উঠে, যদিই চ্যাংড়ার জীবন যায়, মুই জীবন ফিরায়ে দিমু। নাতে দশজনের

ছামত নাকে খৎ দিয়ে জীবনের মনে গুণমাণি ছাড়ি দেম।

সামসের: বেশ তোবে শুরু হোক গুণমানের খেলা। কিন্তুক দশজন বুঝমান এটে হাজির আছেন। কেছু অঘটন ঘটলে মোর দোষ নিবেন না। মুই শ্যাষবার জিজ্ঞাসা করছি এ চ্যাংড়ার মা, বাপ, চিনাজানা কেউ আছেন কিনা?

রঘুনাথ : (ছুটতে ছুটতে আসে) আছি আছি আমি আছি। এই চ্যাংড়া। এই বজ্জাত তুই এটে আছে ছুটিছু।

সামসের: চ্যাংড়া আপনার কে লাগে?

রঘুনাথ : কেউ নয় গুণমান। মোর বাড়িত থাকে। ফাই-ফরমাস খাটে। মোর চাকর।

সামসের: চ্যাংড়ার রাশি জানা আছে।

রঘুনাথ : মুই ক্যামকা করে জানমো। এই চ্যাংড়া বাড়া। শালা! বজ্জাত। তোক মুই কুপেই সাট্ করমো। তোক কনু গাইটাক খানিক কাচা ঘাস কাটে খাবা দি। তুই এটে আসে ফুর্তি মারাছু। চল আইজ তোক মুই জুত করোছি।

বিরাম : চ্যাংড়া কথা কয়না।

রঘুনাথ : চ্যাংড়া জবর শইতান। ধন্দ ধইরে থাকে। বসে বসে ঘুমায়। পিটন না দিলে এলা ঢং ছাইড়বে না।

বিরাম : ঘরেৎ একমা ধন্দ ধইরে থাকে।

রঘুনাথ : পরায় পরায়। কাম কইরতে কইরতে তাকে থাইকে আকাশ দিকে। উদাস। মুই হয়তে কনু এই কি দ্যাখছুরে। গাছতখে পাত পারছে তাই দ্যাখছি। দেখেন দিনি ক্যামকা শয়তান। ঘুমের মইধো চেঁচায় কথা কয়। আর ঢাকের বাজন শুনলে আর কমেন কি এক্কি বারে চুপ। মুখথে রা কইরবে না বিলায়ের নাগাল রোম খাড়া করে ধন্দ ধরে বসে থাইকপে। দেখেন দিনি ই ঢাকের বাজন শুনিছে অমনি কোটটথে থানত আসে ঢুকি পড়িছে। শালা! চান নাই বাসি কাপড়— থানক অসুদ্ধ করি ফেলাবে— শালা। মইরবে মইরবে এমনি কইরে মইরবে কুনদিন। ঐ চ্যাংড়াক নিয়ে মুই এক্কিবারে চলে গেনু। কেছু মনত নেননা গুণমান মুই অক নিয়ে এটথে চলে যাছু। এই শালা বোগদা, বাড়া, বাড়া, থানথে।

বিরাম : অয় বাড়াবে না মণ্ডল। তাকে আছে ঠেকই। কিন্তুক অঁর হুঁস নাই। ওক নিয়ে হামরা দুই গুণমান পাতার খেলা খেলপা চাঁও। তুমি ওর বাপ না হইলেও মালিক। তোমার ইয়াত আপিত আছে।

রঘুনাথ : অঁয় হবে পাতা?

বিরাম : সিটাই তো পরমান হোবে। তেবে তোমার আপত্তি নাই।"

এরপর দ্বিতীয় দৃশ্যের (পৃ. ১৪-১৫) দেবাংশী সারবানের সঙ্গে সেতু বর্মনের সংলাপের কিছু নমুনা তুলে ধরছি—

(সেতু বর্মন ভেজা কাপড়ে সারবানের সামনে এসে দাঁড়ায়)

সেতু : মাও। মুই বিচার চাও। গরীবের প্যাটত হাত দিছে দেবেন মণ্ডল। তিন বছর আগে মিয়া বিয়ার সন মণ্ডলের কাছ জমিন ফেরত কবলা করে ছশ টাকা ধার নিছল। এখন মুই ধার সুধবা চাই, কিন্তুক মণ্ডল ফেরৎ কবলা ফেরৎ দিবার চাহে না। তুমি বিচার করেন মাও। মোক কয়া দেন মাও, মুই এখন কি করমো?

সার : ?

সেতু : মোর উপর দয়া হোবে না মাও। মুই প্যাট শুক্যে মরমো তবু তুমি কিরপা করবেন না। গরীবের আর্জির কুন দাম নাই তুমার কাছে মাও

সার : ?

সেতু : মাও মুই গরীব। তোমাক কেছু দিয়ার সাধ্য নাই আমার। যদি চাও তোমাক মুই নিজের শরীলের অক্ত দিবার পারি। তুমি না হলে গরীবক কে বাঁচাবে মাও?

সার : ?

সেতু : ঠিক আছে মুই এটে হইত্যা দিয়া পড়ে থাকম। যতক্ষণ তোমার আদেশ না হয় মুই এটেই পড়ে থাকম। দেখি তোমার দয়া হয় কিনা?

সার : সেতু আইজ বাড়ী যা।

সেতু : তবে কি বিষহরির দয়া হোবেনা দেবাংশী। মুই যি না খায়ে মরে যাম দেবাংশী। মোর পরিবার ছইল, পইল সব এক্কিবারে ভাস্যে যাবে।

সারবান : আইজ বাড়ি যা। মা বিষহরি আইজ কেচু কবে না?

সেতু : কেন দেবাংশী মোর কি রূপরাধ হইল।

সারবান : তা মুই কবা পারমো না। তেবে তোর আর্জি কেছু ভেন্ন। তাবেই মাওর আদেশ হতে সময় নাগবে।

সেতু : তুমু মাওক কন। মাও তোমার কথা শুনবে তুমু হলেন দেবাংশী।"

উপরে উক্ত 'দেবাংশী' নাটকের নমুনাস্বরূপ সংলাপ বা কথোপকথন ও মূল পাঠ্যাংশের সহায়তায় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় ব্যবহৃত বরেন্দ্রী উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য:

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার লোকমুখে বহুল প্রচলিত কথ্যভাষা বিশেষ করে বরেন্দ্রী উপভাষায় মান্য-চালিত বাংলার মূল ধ্বনিগুলি বজায় আছে। তবে স্বরধ্বনিগুলি শব্দের আদি, মধ্য ও অন্ত্য বিভিন্ন স্থানে নানারকম ভাবে উচ্চারিত হয়। অর্থাৎ উচ্চারিত স্বরধ্বনিগুলি মাত্রাগত কিছু পার্থক্য লক্ষ করা যায়। আবার বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত প্রায় সমস্ত ব্যঞ্জনধ্বনি এই জেলার উপভাষায় বলেছে। যদিও দু একটি ধ্বনির উচ্চারণের কিছু কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হতে দেখা যায়। মোটকথা, স্বর এবং ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ— প্রবণতায় এই অঞ্চলের কথ্য ভাষার তথা বরেন্দ্রী উপভাষার কিছু বিশেষ আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুটিত হয়েছে।

১. আদ্য 'অ' ধ্বনির পরে ই, উ ধ্বনি থাকলে আদ্য 'অ', 'ও' রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন— হইবে < হোবে।

বাক্যে প্রয়োগ : যেমন— ছোড়া পাতা হোবে।

অঁয় হোবে পাতা।

২. 'ই' ধ্বনি সর্বত্র অপরিবর্তিত রূপে উচ্চারিত হলে পদ মধ্যবর্তী 'ই' ধ্বনি ক্রমশ হ্রস্ব হয়ে লোপ হয়, অথবা খুব হ্রস্বভাবে উচ্চারিত হতে দেখা যায়। যেমন— এলা < এইলা।

বাক্যে প্রয়োগ: যেমন— তুমি এলা কি করে বিরাম ভাই।

আবার কখনো অপিনিহিতি জাত 'ই' ধ্বনির ব্যবহার দেখা যায়। যেমন— আইজ < আজি, কইরতে < করিতে।

বাক্যে প্রয়োগ: যেমন— চল আইজ তোক মুই জুত করোছি।

কাম কইরতে কইরতে তাকে থাইকে আকাশ দিকে...

৩. 'এ' ধ্বনি শব্দের আদিতে অপরিবর্তিত রূপে ব্যবহার হতে দেখা যায়। যেমন— এটে, এটি (এখানে), এনা (একটু), এলা/এলাত (এগুলি)।

৪. এই উপভাষায় 'অ্যা' হল একটি মূল স্বরধ্বনি। আদিতে ও পদান্তে ব্যঞ্জনযুক্ত 'অ্যা' ধ্বনির প্রচুর ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

আদিতে 'অ্যা' : যেমন— ক্যামকা, ক্যামন, চ্যাংড়া (অর্থ কিশোর ছেলে), চ্যাচাছিস, ছ্যাঁচাই, ট্যাকা। আদ্য ব্যঞ্জন নিরপেক্ষ।

'অ্যা' ধ্বনি ব্যবহার: ন্যাও, দ্যাখছি, ট্যাকা, দ্যাবতা, শ্যাষবার, ব্যাগার ক্ষ্যামা, ক্ষ্যামতা ইত্যাদি।

অন্ত্য 'অ্যা': শুক্যে, হইত্যা, ভাস্যে ইত্যাদি।

৫. এই উপভাষায় পদাদিস্থিত 'র' সবসময় 'অ' রূপে উচ্চারিত হয়। ফলে আদ্য 'র' এর উচ্চারণ বৈচিত্র্য ও বিকৃতি পরিলক্ষিত হয়। আবার পদাদিস্থিত 'অ' কখনো কখনো 'র'-তে পরিণত হয়। যেমন— আদ্য 'র' > অ : রাজামশাই > আজামশাই

রক্ত > অক্ত, রায় > আয়।

বাক্যে প্রয়োগ: যেমন— ১. মোর আজামশাই-মাওর বাপ।

২. মুখেত অক্ত উঠে মরি যাবে।

৩. বিচারের আয় সেতুর বিপক্ষে গেলে জোতদার মোক ছাইরবেনা।

আবার আদ্য 'অ' > র: যেমন— অপরাধ > রপরাদ, অপমান > রপমান।

বাক্যে প্রয়োগ: যেমন— কেন দেবাংশী মোর কি রপরাধ হইল।

দেবতা মাইনষের রপমান সহ্য হবার নয়।

৫. পদাদিস্থিত 'ল'-এর উচ্চারণে এই উপভাষায় বৈচিত্র্য ও পরিবর্তন দেখা যায় আদ্য 'ল'-এর উচ্চারণ না থাকায় আদ্য 'ল' সর্বদাই 'ন'-এ পরিবর্তিত হয়ে যায়। যেমন— আদ্য 'ল' > ন: লেখাপড়া > নেকাপড়া, লাগলে > নাগলে, লাগছে > নাগছে।

বাক্যে প্রয়োগ: যেমন— তা ফির এলা নিয়ে নেকাপড়া করবা চাছেন কেন?

মোর শাপ নাগলে তুই মোক বাঁচাবু।

অস্থির নাগছেরে জবর অস্থির নাগছে।

৭. দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বরেন্দ্রী উপভাষায় উচ্চারণগত দিক থেকে স্বরধ্বনির ও ব্যঞ্জনধ্বনির যে নানা রকমের পরিবর্তন সাধিত হয় ভাষাভিত্তিক ধ্বনি পরিবর্তনের নিয়মানুযায়ী সেগুলি এখানে তুলে ধরছি।

১. দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার এই উপভাষায় অপিনিহিতির অধিক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। তবে এ বিষয়ে রাজশাহী ও বগুড়া জেলার বরেন্দ্রী উপভাষার নৈকট্য ও প্রভাব কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করেছে এ জেলায় ব্যবহৃত কিছু অপিহিনিতির নিদর্শন—ক্রিয়াপদে— আইসবা, কইরবা, গেইছে, ছাইড়বে, আইকবা, ধইরবা, পাইলটে, পুইরবে, ফুইটবে, বইসে, মইরবে।

বিশেষ্য পদে— মাইনষের। এছাড়াও অপিনিহিতি 'য' ফলা অন্ত্যক শব্দেও হয়। যেমন— কন্যা > কইন্যা।

২. এই উপভাষায় কখনো কখনো আদিস্বরাগম পরিলক্ষিত হয়। যেমন— স্পর্ধা < আস্পদ্ধা, বাক্যে প্রয়োগ : কী আস্পদ্ধা! কী সাহস! দেবতার গায়ে হাত!

৩. স্বরাগমের মধ্যে এই উপভাষায় মধ্য স্বরাগম বা বিপ্রকর্ষের ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

যেমন—

পরনামী < প্রণামী, পরমান < প্রমাণ।

পরায় < প্রায়, পিরপা < কৃপা।

পরসাদ < প্রসাদ, পরথম < প্রথম।

নইজ্যা < নইজ্জা < লজ্জা, পরধান < প্রধান।

৪. এই উপভাষায় স্বর সঙ্গতির ব্যবহার লক্ষিত হয়। পরবর্তী 'ই'-এর কিংবা 'ঈ'-এর প্রভাবে পূর্ববর্তী আ > ই, এ > ই তে পরিণত হয়। যেমন— বেটি > বিটি। পরবর্তী আ, এ, ও স্বরধ্বনির প্রভাবে পূবর্তবর্তী এ-কারের বিকৃত উচ্চারণ অ্যা: দেখছি > দ্যাখছি, নাও > ন্যাও।

৫. এতদ্ অঞ্চলের উপভাষায় সমীভবনের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

পরাগত সমীভবন: যেমন— কতদিন > কদ্দিন।

বিষমী ভবন: যেমন— শরীর > শরীল।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য:

দক্ষিণ দিনাজপুরের বরেন্দ্রী উপভাষা রীতিতে রূপতত্ত্বের দিক থেকে কতকগুলি স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয় যা ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে গুরুত্বপূর্ণ। যেমন— সর্বনাম, কারক ও বিভক্তি, উপসর্গ, অনুসর্গ, লিঙ্গ, বচন, ক্রিয়ার কাল ও রূপ, অসমাপিকা ক্রিয়া, যৌগিক ক্রিয়া, প্রত্যয়, সমাস ইত্যাদি। এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এতদ্ অঞ্চলের এই কথ্য ভাষায় বা আঞ্চলিক উপভাষায় রচিত 'দেবাংশী' নাটকের সংলাপে বা কথোপকথনের পরিসরের মধ্যে রূপতত্ত্বের দিক থেকে উক্ত যে বৈশিষ্ট্যগুলি পরিস্ফুটিত হয়েছে, সেগুলির কিছু নিদর্শন দেখানো হচ্ছে।

১. দক্ষিণ দিনাজপুরের এই উপভাষায় সর্বনাম পদের পূর্ণাঙ্গ ও বিচিত্র ব্যবহার লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে কারক ও পুরুষভেদে সর্বনামের বিচিত্র ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

কর্তৃকারকে সর্বনামের রূপ নিম্নে তুলে ধরা হল—

পুরুষ	এক বচন	বহুবচন
উত্তম পুরুষ	মুই/মোক/মোর	মোরা/হামার/হামরা/হামাহরে
মধ্যম পুরুষ	তুই/তোক/তুমু/তোর	তুমার/তুমাক
প্রথম পুরুষ	অয়/অঁর/অক	অরা

সর্বনাম:

প্রকৃতি	**এক বচন**	**বহু বচন**	**বচন নিরপেক্ষ**
ক. নিকট নির্দেশক	ইট, ইটা, ই,	এলা, সিলা	

(সমীপ্যবাচক)	সিটাই, ইটাই	
খ. দূর নির্দেশক (দূরত্ব বাচক)	উটা, ঐটে, উটাত	ঐলা
গ. অনির্দিষ্ট ও প্রশ্নাত্মক		কে, কেয়, করে, কার
ঘ. পরিমাণ নির্দেশক		এনা, কিছু, তামান, কেছু, বেবাক,
ঙ. স্থান নির্দেশক		কুনটি, এটে, এটা, সিলা, কুনঠে, কোটে, কটে, কোটখে,
চ. সময় নির্দেশক		কদ্দিন, ইবার, এলায়, সিদিন, এ্যাতদিন, ত্যাখন।

২. কারক ও বিভক্তি:

এ জেলার উপভাষায় কর্তা, কর্ম, করণ, অপদান, সম্বন্ধ ও অধিকরণ এই ছয়টি কারকের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। নাটকটির মূল পাঠ্যাংশের মধ্য থেকে তার কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হল।

ক. কর্তৃকারক:

এই উপভাষায় কর্তৃকারকের প্রয়োগের আধিক্য লক্ষ করা যায়—

শূন্য বিভক্তি— মা বিষহরি আইজ কেছু কবে না।
ছোড়া পাতা হোবে।
অঁয় হোবে, পাতা।
তুই মোক বাঁচাবু।

খ. কর্মকারক:

প্রধান ‘ক’ বিভক্তি — মোক কিরপা কর মাও।
চ্যাংড়াক নিয়ে খেলা কইরবা চান।
মোক ক্ষ্যামা করে দে।
তোমাক কেছু দিয়ার সাধ্য নাই।

শূন্য বিভক্তি— মুখেত অক্ত উঠে মরি যাবে।

গ. করণ কারক: ‘ত’ বিভক্তি দিয়ে (দিয়া) অনুসর্গের ব্যবহার—

‘ত’ বিভক্তি — কথাত কথাত ইংরাজী কয়।

নাকোত পোটা পড়েছে অঁয় হোবে পাতা।

'দিয়া' অনুসর্গ — আইন দিয়া ওগুলাক ঠিক করা যাবে না।

এখন বাওনাক দিয়ে মামলা করাছে জাফরের নামে।

ঘ. অপদান কারক: 'এ' বিভক্তি, থাকি (থেকে) অনুসর্গের ব্যবহার—

'তে' বিভক্তি— ছোট আদালতে সুবিচার না পালে মানুষ উচা আদালত যাবে।

বিষহরির আদালতে সুবিচার না পালে

তাঁর উচায় কুন আদালত আছে লোহার?

থাকি (থেকে) অনুসর্গ— বাড়ীত্থে বার করে দিছে।

পাছতথে নিজে বইসে খুঁটি চালান দিছে।

ঙ. অধিকরণ কারক:

'এ' বিভক্তি — বিষহরির দরবারে নিস্পত্তি হয়

পূজার থানে অমকা চেচাছেন কেন।

এটে ঢুকলু ক্যামকা করে রে।

'ত' বিভক্তি— গরীবের প্যাটত হাত দিছেন গোবর্ধন মণ্ডল।

থানত ঢুকি পড়েছে।

গাওত এলা চলে।

চ. সম্বন্ধ পদ: মান্য চলিত বাংলার মতোই এই উপভাষায় 'র'-এর বিভক্তি রূপে অধিক ব্যবহার হয়।

'র' বিভক্তি— দেবতার গায়ে হাত।

ই চ্যাংড়ার রাশি কেউ জানে?

মাওর আদেশ হতে সময় নাগবে।

'এর' বিভক্তি— উহিনি সরকারের মুখতে অক্ত উঠাবে দেবাংশী।

গরীব মাইনষের উপকার করবা পারি।

৩. উপসর্গ: এই উপভাষায় উপসর্গের ব্যবহার সাধারণত কম লক্ষ করা যায়।

তৎসম: অপ— অপঘাত

অপ— রপরাদ/রপরাধ, রপমান

অর্ধ-তৎসম: প্র পো— পরনাম, পরথম, পরসাদ, পরায়

বাংলা: অ, আ— অঘটন, অমকা, আপিত্ত, আচমকা

বিদেশী: বে ব্যা— বেবাক, বেহুশ।

৪. অনুসর্গ : এই উপভাষায় অনুসর্গের ব্যবহারে আধিক্য দেখা য়ায়।

আগৎ— ই মানুষটি মুই চিতায় যাবার আগতক দিশাবার পারমো দেবাংশী।

পাছৎ— ১. পাছতথে নিজে বইসে ঘুঁটি চালান দিছে।

২. হ তুমি যেলা করবা চাহেন কর হামরা তোমার পাছৎ আছি।

৩. ঐ যে সন্ন্যাসী তলা আছে, তার পিছত কারুর পাছৎ নাগে না।

তনে/তানে (তে; কে)— ই সেই তংকেই তোমাক ডাকে পাঠাছি মোর তংকেই তোর যাওয়া হয় না।

৫. লিঙ্গ : এই অঞ্চলের উপভাষায় লিঙ্গের ব্যবহার দেখা যায়।

স্ত্রীলিঙ্গ নিদেশক শব্দ বা পূর্বপদ হল— 'বেটি'

স্ত্রীলিঙ্গ বাচক— ই/ঈ বেটি/বিটি, মিয়া,

পুংলিঙ্গ বাচক—প্রত্যয় হল 'আ'।

পুংলিঙ্গ নিদের্শক শব্দ বা পূর্বপদ হল— মরদ।

পুংলিঙ্গ:

পুরুষবাচক প্রত্যয়— আ বেটা, বাপ, ছইলটা, ছাওয়াল, পইসাওয়ালা।

৬. বচন: এক বচন নির্দেশক বহুল প্রচলিত বিভক্তি হলো— ট, টা, খান।

প্রাণীবাচক শব্দে— ট, টা ব্যবহৃত হয়। যেমন— রাইক্ষসটা, মানুষটা, বিটিটা।

বস্তুবাচক শব্দে— খান যুক্ত হয়। যেমন— গামছাখান।

বাক্যে প্রয়োগ: গামছাখান এক্কেবারে ছিড়ে ফাইরে গেইছে।

বহুবচনে বিভক্তি হল— লা।

তবে এতদ্ অঞ্চলে এই উপভাষায় সর্বনাম পদে 'রা' বিভক্তি যোগ করেও বহুবচন নির্দেশিত হয়। যেমন— হামরা, তোরা, মোরা ইত্যাদি। বহুবচনের বিভক্তি হল— 'লা'।

৭. ক্রিয়ার কাল ও রূপ:

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, এই উপভাষায় ক্রিয়ার কাল ও রূপভেদ সম্বন্ধে 'দেবাংশী' নাটকের মূল পাঠ্যাংশের (Text Book) সংলাপ বা কথোপকথনের পরিসরের মধ্যে এই বরেন্দ্রী উপভাষার ক্রিয়ার কাল ও রূপের পুরুষভেদে উভয় বচনে কিছুক্ষেত্রে পৃথক ক্রিয়াবিভক্তির প্রয়োগ হয়, এর পরিপূর্ণ রূপ এখানে না পাওয়ায় বচন ভেদে ক্রিয়াপদের রূপের পরিবর্তন তুলে ধরা সম্ভব হয়নি।

৮. সমাস: এই উপভাষায় দ্বন্দ্ব, তৎপুরুষ কর্মধারয়, দ্বিগু, বহুব্রীহি— এই কয়েক প্রকার সমাসবদ্ধ

পদের অধিক ব্যবহার— পরিলক্ষিত হয়। দেবাংশী নাটকের সংলাপ থেকে এগুলির কিছু নিদর্শন দেখানো হচ্ছে।

দ্বন্দ্ব সমাস: যেমন— গুণ ও মান = গুণমান।

তৎপুরুষ সমাস:

যেমন— দেবের অংশী = দেবাংশী, সম্বন্ধ তৎপুরুষ সমাস।

নয় ঘটন = অঘটন, নঞর্থক তৎপুরুষ সমাস।

নেই পরোয়া = বেপরোয়া, নঞর্থক তৎপুরুষ সমাস।

বিষ হরণ করেন যিনি = বিষহরি, উপপদ তৎপুরুষ সমাস।

বেষ্টন করে আছে যা = আবিষ্ট, উপপদ তৎপুরুষ সমাজ।

জোতের দার = জোতদার, সম্বন্ধ তৎপুরুষ সমাস।

দেবতার মধ্যে আদি দেব যিনি = দেবাদিদেব, উপপদ তৎপুরুষ সমাস।

নেই আপত্তি = নিষ্পত্তি, নঞর্থক তৎপুরুষ সমাস।

নয় ভাবনীয় = অভাবনীয়, নঞর্থক তৎপুরুষ সমাস।

মাসের শেষদিন যা = সংক্রান্তি, উপপদ তৎপুরুষ সমাস।

কর্মধারয় সমাস:

যেমন— মহান যে রাজা = মহারাজা, কর্মধারয় সমাস।

সু যে বিচার = সুবিচার, কর্মধারয় সমাস।

মহান যে দেব = মহাদেব, কর্মধারয় সমাস।

কালো যে পাহাড়ী = কালোপাহাড়ী, কর্মধারয় সমাস।

দ্বিগু সমাস:

যেমন— চার হদ্দির সমাহার = চৌহদ্দি, দ্বিগু সমাস।

বহুব্রীহি সমাস:

যেমন— পইসা আছে যার = পইসাওয়ালা, বহুব্রীহি সমাস।

দুই পা আছে যার = দোপায়া, বহুব্রীহি সমাস।

মহা পাপ আছে যার = মহাপাপী, বহুব্রীহি সমাস।

৯. প্রত্যয়: এই উভাষায় কৃৎ প্রত্যয় এবং তদ্ধিত প্রত্যয়— এই উভয় প্রকার প্রত্যয়ের ব্যবহার দেখা যায়। 'দেবাংশী' নাটকের সংলাপ বা কথোপকথন থেকে কৃৎ এবং তদ্ধিত প্রত্যয়ের কিছু নিদর্শন তুলে ধরছি।

কৃৎ প্রত্যয়: প্রত্যয়গুলি হল— আ, আল, ইল, ইয়ে।

আ-'আ' প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষ্য ও বিশেষণ হয়।

ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য— বাড়্ + আ = বাড়া। যেমন— ''শালা বোগদা, বাড়া, বাড়া, থানত্থে।''

এইরূপ— পা + আ = পাবা

চা + আ = চাবা

বুঝ + আ = বুঝা

শুন্ + আ = শুনা

ইয়ে — কর্ + ইয়ে = করিয়ে > কইরে। যেমন—''ইবার দেখি মণ্ডল ক্যমকা কইরে জমির দখল নেয়।''

এইরূপ— ধর্ + ইয়ে = ধরিয়ে > ধইরে।

বস্ + ইয়ে = বসিয়ে > বইসে।

তদ্ধিত প্রত্যয় : প্রত্যয়গুলি হল— ই, উ, তি, আল, আলো, আলি, ইয়া, উয়া, মা, বান্ প্রভৃতি।

আল/য়াল— ছাও + আল = ছাওয়াল। যেমন— ই ছাওয়াল সামান্য মুনিষ্যি নয়।

ই— বিষহর + ই = বিষহরি। যেমন— মোক রেহাই দে মা বিষহরি— মোক রেহাই দে।

এইরূপ— পাপ + ই = পাপী

চালাক + ই = চালাকি

দক্ষিণ দিনাজপুর (বালুরঘাট) তথা পশ্চিমবঙ্গের স্বনামধন্য নট-নাট্যকার, নাট্য-নির্দেশক হরিমাধব মুখোপাধ্যায় রচিত 'মন্ত্রশক্তি' নাটকে উত্তরবঙ্গের পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট মহকুমা সংলগ্ন খাঁপুড়ে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে তেভাগা আন্দোলন বেশ শক্তপোক্তভাগে সুসংগঠিত হয়ে প্রশাসনকে রীতিমতো নাড়িয়ে দিয়েছিল। অর্থাৎ তৎকালীন ইংরেজ-শাসিত ভারতের কৃষক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে এই 'মন্ত্রশক্তি' নাটকের কাহিনী গড়ে উঠেছে। মোটকথা, অখণ্ড বাংলার দিনাজপুর জেলার বর্গাদার কৃষকদের (Share croper) উৎপন্ন ফসলের $^{২}/_{৩}$ অংশ আধিয়ারদের এবং ১/৩ অংশ জোতদারদের— এই দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে শেষপর্যন্ত মন্ত্রশক্তি নাটকে ভূমিজ সন্তানদের বাঁচার জন্য সংগ্রামের সোচ্চার সংলাপ শোনা যায়। নাটকের কাহিনীতে দেখা যায়, সাধারণ কৃষক রমণী যশোদা বর্মণ জনৈক সামসেরের আড়ালে থেকে এই তেভাগা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে পরিচালনা করেন এবং নানা কৌশল অবলম্বন করে কৃষকদের সংগঠিত করে তুলে

এই আন্দোলনের সঙ্গে সমাজের অন্যান্য অংশের মানুষকেও যুক্ত করে প্রশাসনকে নাস্তানাবুদ তথা পর্যুদস্তর মধ্য দিয়ে বর্গাদার তথা আধিয়ার কৃষকদের হাতে ফসল তুলে দিয়েছেন।

নাট্যকার হরিমাধব মুখোপাধ্যায় এই নাটকে আঞ্চলিক চরিত্র ও পরিবেশকে অতি যত্নসহকারে ও নিপুণতার সঙ্গে তুলে ধরার ফলে এতদ অঞ্চলের সাধারণ গ্রাম্য মানুষদের মাটির গন্ধে ভরে ওঠা জীবন-কথা সুস্পষ্ট রূপে তুলে ধরেছেন। তাই সঙ্গত কারণে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জনসাধারণের মুখের কথ্যভাষার কথ্যরূপের বিশেষত বরেন্দ্রী উপভাষার বাস্তব নিদর্শন 'মন্ত্রশক্তি'তে পরিস্ফুটিত হয়েছে। এই 'মন্ত্রশক্তি' নাটকটি 'ত্রিতীর্থে'র প্রয়োজনায় ও হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় সমগ্র উত্তরবঙ্গসহ কলকাতার গিরিশ মঞ্চে অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে পরিবেশন করে দর্শক কুলের কাছে সমাদৃত হয়ে বহুল প্রশংসিত হয়। এই নাটকের কাহিনীর শুরুর অংশে (১ম দৃশ্য, পৃ. ৫-৭) সংলাপ বা কথোপকথন এতদ অঞ্চলের এই আঞ্চলিক উপভাষার— দৃষ্টান্ত স্বরূপ অত্যন্ত দরিদ্র গৃহস্বামীর রসুল ও তার স্ত্রী আমিনার কথোপকথনের কিছু অংশ তুলে ধরছি—

আমিনা : ''শুনিছ... ইবার উঠো।

রসুল : (ঘুম জড়ানো গলায়) কি? (পাশ ফিরে শোয়)

আমিনা : উঠপা না আইজ?

রসুল : উহু।

আমিনা : পাগল হইলা নাকি? উঠো শিগগির। রাত অনেক হইচে।

রসুল : হোক ...

আমিনা : ঠিক আছে বারায়ো না। ঘরত একদানা চাইল নাই। কাইল খাবা কি?

রসুল : খামো না।

আমিনা : উপাস দিমেন?

রসুল : হ।

আমিনা : দুধের ছোরাটাক না খাওয়ায়ে রাইখবেন (বাচ্চাটা কেঁদে ওঠে। আমিনা ঘরে যায়।)

রসুল : (উঠে পড়ে) ভাত রাধছিস?

আমিনা : (ভেতর থেকে) হ।

রসুল : পানি দি।

আমিনা : (ভেতর থেকে) বদনীত আছে। (রসুল বদনীর জলে মুখ-চোখ ধোয়। আমিনা বাইরে আসে।

রসুল : দি খাবা দি। (আমিনা থালায় ভাত বাড়ে। কলমীশাক, নুন, পেঁয়াজ, কাঁচালঙ্কা এই

হল ব্যঞ্জন।)

রসুল : (খেতে খেতে) শরীলটা ভালো ঠেকছে না রে।

আমিনা : ডাইকপা কইলা তাই ডাকিছি।

রসুল : শালা মুখুটি ... দিনভর পোকরের পানা সাফ করালো। সইনন্ধা বেলাতে কনু বাবু ট্যাকাটা। তে কইল খুচরা ট্যাকা নাই কাচত শনিবারে হাটত যাইস বাবু। শালা সোমবারে কাম, শনিবারে মজুরি। কিপটা বুড়া। এই পিঠটা এনা হিচঁড়ে দি। শালা দিনভর পানা খাইটে সারা গাও চুলকাছে। আর এনা উপরে ... হু হু হিচঁড়া হিচঁড়া। আর এনা জোরে দি। হু হু। আ ... কলমীশাক যা রাধিছু তা কি কমো। জবের সোয়াদ হচে। মনত হয় তোর হাতত চুমা খাই।

আমিনা : আহা ঢং!

রসুল : ঢং নয়, ঢং নয়। সত্যি কছি। তোর হাতের আন্ধনের সোয়াদই ভিন্ন। দি দি, আর চাইরটা ভাত দি। (আমিনা হাঁড়ি থেকে সব ভাত তুলে দেয়। রসুল আমিনার হাত চেপে ধরে।)

রসুল : থাক... থাক... ও কটা তোর জইন্যে থাক।

আমিনা : মুই খাইছি।

রসুল : কি খাইছিস?

আমিনা : (নীরব)

রসুল : মুই সব বুঝা পারিরে। (আমিনা মুখ নীচু করে) মুই খাইলে তোর জিউ ঠান্ডা হয় না

আমিনা : আমিনা (মাথা নেড়ে সমর্থন করে)

রসুল: তুই খাইলে যে মোর জিউ ঠাণ্ডা হয়, সিটা বুঝা পারিস? (আমিনা হাসে। রসুল নিজের পাত থেকে ভাত তুলে হাঁড়িতে রাখে। বদনী নিয়ে মুখ ধুতে যায়। মুখ ধুয়ে একটা তৃপ্তির ঢেকুর তোলে বারান্দায় বসে একটা পোড়া বিড়ি বের করে লম্ফের আলোতে ধরায়।)

রসুল : লম্ফত ত্যাল নাই নাকি রে।

আমিনা : ব্যাবাক ত্যাল গায়ে মাইখলা যি।

রসুল : কি করমো, জবর চুলকানি। শালা পঁচা পানার চুলকানি। (লম্ফটা ঝাঁকায়) রাইতভর আঁধারত থাইকপু?

আমিনা : কি হোবে?

রসুল : তোক যদি কেউ চুরি কইরে নিয়া যায়।

আমিনা : ঢং!

রসুল : সত্যি কছি আমিনা, তুই এক ছইলের মাও কে কোবে। নিকার দিন তোক যেমুন দেখিছনু তুই ত্যামকাই আছিস।

আমিনা : যাও। (আমিনা উঠে যেতে চায়। রসুল হাত ধরে তাকে পাশে বসায়)

রসুল : বইস, বইস। মোর সাধ যায় তোক এনা সাইজে-সুইজে রাখি। মুখুটির দ্বিতীয় পক্ষ যেমন— সাইজে-গুইজে থাকে, তেমনু। পাওত আলতা, মল। মুখত হিমানী, কানত দুল, জড়ির শাড়ি। কিন্তুক শালা কপাল ফুটা। একদিন কাম তো তিন দিন বেকার। শালা তেভাগার জ্বালা রাতের ধান্দাও বন্দ হবা বসিছে।

আমিনা : ক্যান, তেভাগা ফির কি কইরলো।

রসুল : বাড়ির ভিতর থাকিস, কেচুই ট্যার পাইস না। আজ তিন মাস হইলো গাঁওত শুরু হইচে এক হুজ্জুত। তেভাগা কইরবি কর, তাত হামার কেচু করার নাই। কিন্তুক শালা রাইত ছাড়া অমাহারের কাম নাই। দিনের বেলায় কেচ্চু ঠাহর পাইবি না? সব মুখত চাবী আইটে যে যার কাম করেছে। রাইত হইলো কি শুরু হইল ফিসফাস... এটে সেটে মিটিন। রাত তিনটার আগে কেউ শালা বিছানাত যাবে না। তে সিঁদ কাইটমো কখন?

আমিনা : চাষীগুলানের বাড়িততো আর সিঁদ কাইটপা না। তারা জাইগে থাইকলে দোস কি?

রসুল : তোর দেখছি জবর বুদ্ধি। চাষাগুলান মিটিন করোছে তে বাবুগুলানের ঘুম নাই। চাষাগুলান মিটিন করেছে কেমন কইরে তেভাগা কইরবে। আর মুখুটি, রাজব আলী মদন কুণ্ডু, এরা মিটিন করোছে ক্যামন কইরে তেভাগা রুখা যায়। দারোগা, মাখন আই বি, চৌকিদার—এরা মিটিন করোছে ক্যামন কইরে সামসেরক ধরা যায়।"

এরপর তৃতীয় দৃশ্যের (পৃ. ১৫-১৬) বদন মাঝি, তার ছেলে বিশু ও সেই সঙ্গে সিরাজুল ও নগেনের মধ্যে সংলাপ বা কথোপকথনের কিছু অংশ তুলে ধরছি—

বদন : তাড়াতাড়ি যা, ঘাটে নাও বাঁধা— একঘড়ি পার হয়া গেল। ঘাট পারাবার তংকে মানুষজন বুঝি বইসে আছে।

বিশু : হুঁ, মানুষের মেলা বসিছে ঘাট পারাবার তংকে— দুপুর রাইতে।

বদন : না বসুক মেলা। ঘাটে আইসে নৌকাত মাঝি না দেইখলে ঠুকে দিবে নালিশ

পিসিডেন্টের কাছে।

বিশু : ঠুকুক নালিশ।

বদন : দেখোদিন বাপু— মুই হছি ইউনিয়নবোডের চাকর। পিসিডেন্টের কথা মোক মানাই নাইগবে। এর আগে তোর তংকে মুই দুইবার পিসিডেন্টের কাছে গাইল খাছি—

বিশু : মোর তংকে!

বদন : তে নাতে কি? একবার ঘাটত নৌকা বাইধে শহরত গেলু সার্কাস দেইখবা। শীতের রাইতে মুই বুড়া মানুষটা নদী সাঁইতরে ওপার থে নৌকা নিয়া আনু ... আর একবার তো ...

বিশু : ন্যাও ন্যাও, হছে ... এক কথা বারবার শুনবা ইচ্ছা করে না। চুপ দ্যাও।

বদন : দু'বারই পিসিডেন্টের হাত-পাও ধইরে মাপ চায়ে কোন মতে বাঁচিছি। আবার নালিশ হইলে চাকরি যাবে। দেখোদিন, বইসে আছে ... যা ঘাটত যা ...।

বিশু : দূর! নৌকা ঠেইলতে মোর ভাল লাগে না।

বদন : তোক নিয়ে তো দেখছি মুশকিল হইল। নৌকা ঠেইলতেও ভাল লাগে না তে কি করবু তুই ... পেটত এক অক্ষর বিদ্যা নাই ... কি কইরে খাবু তুই?

বিশু : মুই পুলিশত ঢুকমো। কতবারে কইছি, মেকে পুলিশত ঢুকা দ্যাও ... না, ঘরোত বইসে থাক আর লগি ঠেল। (ভেতরে যায়। একটা জামা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে আসে। বদনের হাতের গ্রাস মুখের কাছে গিয়ে থেমে যায়। বিস্মিত চোখে বদন বলে)

বদন : কোটে যাছু?

বিশু : (জবাব না দিয়ে এগোতে থাকে।)

বদন : যাছু কোটে?

বিশু : যাত্তা শুইনবা।

বদন : কি শুইনবা?

বিশু : যাত্তা যাত্তা!

বদন : যাত্তা! কোটে?

বিশু : চড়কডাঙ্গা।

বদন : এত রাইতে তুই চড়ক ডাঙ্গা যাবু যাত্তা শুইনবা?

বিশু : নিরুত্তর।

বদন : যা যা ... বুড়া বাপ খাওয়া ফেইলে যায়ে লগি ঠেলুক। দিন তামান খাটনী, রাইতে খাওয়ার পর একটু বিশ্রাম ... তাও কপালে নাই। এর নাম ছইল। শালা এই ছইলের তংকে মুই কিনা করি! না, অনেক হইছে ...।

(বলতে বলতে প্রায় কেঁদে ফেলে। ঠিক সেই সময়ে সিরাজুল ও নগেন ঢোকে। তারা হয়তো বদনের শেষ কথাগুলো শুনেছে।)

সিরাজুল: কি হইল চাচা?

বদন : আর ভাইরে জ্বইলে গেনু। বুড়া বয়সে এই ছাওয়াল নিয়ে এক্কেবারে জ্বইলে গেনু। যি দিক মন চায় চলে যামো।

নগেন : সি যখন যাবা যায়ো। এখন কি হইছে কও। (বিশুকে) কিরে, কি হইল?

বদন : আরে ভাই, দিন তামান লগি ঠেলা ... শরীলে আর কত সয়? বয়স তো হইল। এক পহর তক লগি ঠেইলে আইসে ছইলক ভাত আইন্দে খাওয়ায় কলাম, যা আর এক ঘড়ি খেয়াঘাট সামাল দি। মুই খানিক জিরাই। কাজটা সাইরে আসে তুইও শুতি পর।"

উপরে উক্ত এইসব সংলাপ ও মূল পাঠ্যাংশের মধ্য দিয়ে এতদ অঞ্চলে লোকমুখে বহুল প্রচলিত বরেন্দ্রী উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যি তুলে ধরছি।

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য:

এই অঞ্চলের উপভাষায় চলিত বাংলা ভাষার মতোই মূল স্বরধ্বনিগুলি হল— আ, ই, উ, এ, অ্যা, ও। তবে এই স্বরধ্বনিগুলি উচ্চারণের ক্ষেত্রে মূলত শব্দের আদি, মধ্য ও অন্ত্যে মাত্রাগত কিছু পার্থক্য লক্ষিত হয়। এবং এই উপভাষায় চলিত বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত প্রায় সব ব্যঞ্জনধ্বনি বজায় থাকলেও কিছু ধ্বনির উচ্চারণের ক্ষেত্রে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। সুতরাং স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণগত পার্থক্যের মধ্য দিয়ে এই অঞ্চলের বরেন্দ্রী উপভাষার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের প্রয়োগ দেখা যায়।

১. আদ্য 'অ' ধ্বনির পরে ই, উ ধ্বনি থাকলে আদ্য 'অ' ও রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন—

হইবে > হোবে

হউক > হোক

বাক্যে প্রযোগ: যেমন— ''ধানের তিন ভাগে দিবা হোবে
সামসেরক জ্যালে পুইরবা হোবে।"

আমিনা : ''পাগলা হইলা নাকি? উঠো শিগগির। রাত অনেক হইচে।

রসুল : হোক ....”

২. ‘ই’ ধ্বনি সর্বত্র অপরিবর্তিত রূপে উচ্চারিত হয়ে থাকে। তবে মধ্যবর্তী ‘ই’ ধ্বনি ক্রমশ হ্রস্ব হয়ে লোপ হয়, কখনো খুবই হ্রস্বভাবে উচ্চারিত হয়। যেমন— হল < হইল।

বাক্যে প্রয়োগ: যেমন— তেবে তো মুশকিল হল?

এছাড়াও কখনো কখনো অপিনিহিতি জাত ‘ই’ ধ্বনির ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

যেমন— কাইল < কাল, আইজ < আজ

বাক্যে প্রয়োগ: যেমন— কাইল খাবা কি?

উঠপা না আইজ?

৩. ‘এ’ ধ্বনি শব্দের আদিতে থেকে অপরিবর্তিত রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন— এটে/এটি (এখানে), এ্যানা/এনা (একটু), এলা (এগুলি)

৪. ‘অ্যা’ ধ্বনি এই উপভাষায় একটি মূলস্বরধ্বনি। তাই এই অঞ্চলে আদিতে ও পদান্তে ব্যঞ্জনযুক্ত ‘অ্যা’ ধ্বনির বহুল ব্যবহার লক্ষিত হয়। যেমন— আদিতে ‘অ্যা’।

আদিতে অ্যা: যেমন— ক্যান, চ্যালা, খ্যামতা, ট্যাকা, জ্যালে, ট্যার, ঠ্যাং, ব্যাটা, ত্যাল, ম্যালাই, শ্যাষ, দ্যাওয়ার, ন্যাও, ত্যামকাই, দ্যাখ, প্যাট, প্যাচাল।

আদ্য ব্যঞ্জন নিরপেক্ষ ‘অ্যা’ ধ্বনি ব্যবহার। যেমন— এ্যাদ্দিন/এ্যাতদিন, এ্যানা

অন্ত্যে ‘অ্যা’: শুন্যা, ভাগ্যি লাঠ্যাল, দ্যাওয়ার, ন্যাও, ত্যামকাই, দ্যাখ।

৫. পদাদিস্থিত ‘র’ ধ্বনি এই উপভাষায় সর্বদা ‘অ’ রূপে উচ্চারিত হয় জন্য ‘আদ্য’, ‘র’-এর উচ্চারণগত বৈচিত্র্য ও বিকৃতি দেখা যায়।

যেমন— রাঁধে > আইন্ধে, রক্ত > অক্ত, রান্ধন > আন্ধন।

বাক্যে প্রয়োগ: যেমন— এক প্রহর তক লগি ঠেইলে আইসে ছইলক ভাই আইন্ধে খাওয়ার কলাম ....।

বোতলেতে সাদা জল
বুকের ভেতর অক্ত
কোনটা ছাড়ি কোনটা ধরি
দিশা করাই শক্ত।
তোর হাতের আন্ধনের সোয়াদই ভিন্ন।

৬. এই উপভাষায় পদাদিস্থিত ‘ল’-এর উচ্চারণে বৈচিত্র্য ও পরিবর্তন লক্ষিত হয়, অর্থাৎ আদ্য ‘ল’-এর উচ্চারণ না থাকার জন্য আদ্য ‘ল’ সর্বদাই ‘ন’-এ পরিবর্তিত হয়।

যেমন— আদ্য ল > ন: লাগে > নাগে, লাগবে > নাইগবে, লাফাচ্ছে > নাফাচ্ছে

বাক্যে প্রয়োগ: যেমন— কিন্তু ছাড়, কিছু তো একটা করা নাগে?

পিসিডেন্টের কথা মোক মানাই নাইগবে।

মনটা আজ খালি নাফাছে নাফাছে।

এই উপভাষায় স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণগত যে নানা প্রকারের পরিবর্তন লক্ষিত হয়, ধ্বনি পরিবর্তনের সূত্র অনুসারে সেগুলি তুলে ধরা হল।

১. এতদ্ অঞ্চলের উপভাষায় অপিনিহিতির যথেষ্ট ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

উদাহরণ— ক্রিয়াপদে— আইসলে, আইনবো, কইরে, কইরলো, কাইল, কইরবে, কাইটমো, কইলা, খাইয়েছেন, খুইচে, চইলবে, ডাইকপা, ডাইকতে, থাইকপু, থাইকেন, দেইখতে, ধইরে, পাইরবে, পইড়লো, পাইবি, পাইতে, বইস, বুইঝলু, মাইখলা, মাইনবা, রাইখবেন শুইনলে, হইলো, হইলা, হইচে।

বিশেষপদে— ছইল

তাছাড়াও 'য' অন্তক শব্দে অপিনিহিতি হয়। যেমন—

সন্ধ্যা > সইন্ধা, বাধ্য > বাইধ্য।

২. এই অঞ্চলের উপভাষায় মধ্য স্বরাগম বা বিপ্রকর্ষের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

৩. স্বরসঙ্গতি জনিত কারণে পরবতী আ, এ, ও স্বরধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী 'এ'-কারের বিকৃত উচ্চারণ 'অ্যা' হয় । যেমন— দেখে > দ্যাখে, বেটা > ব্যাটা, নাও > ন্যাও, জেলে > জ্যালে।

যেমন—গেরাম < গ্রাম, পরনাম < প্রণাম

পরথম < প্রথম, পইযন্ত < পর্যন্ত

৪. এই উপভাষায় স্বরসঙ্গতির ব্যবহার দেখা যায়। পরবতী 'ই'-এর কিংবা 'ঈ'-এর প্রভাবে পূর্ববর্তী আ > ই, এ > ই -তে পরিণত হয়। যেমন— প্রেসিডেন্ট > পিসিডেন্ট।

বাক্যে প্রয়োগ: ঘাটে আইসে নৌকাত মাঝি না দেইখলে ঠুকে দিবে নালিশ পিসিডেন্টের কাছে।

৫. এই উপভাষায় সমীভবনের ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

পরাগত সমীভবন : যেমন— এতদিন > অ্যাদ্দিন।

বিষমীভবন: যেমন— শরীর > শরীল।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য:

রূপতত্ত্বের দিক থেকে এতদ্ অঞ্চলের বরেন্দ্রী উপভাষার বিশেষ স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়, যা

ভাষাতাত্ত্বিক মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। যেমন— সর্বনাম, কারক ও বিভক্তি, উপসর্গ, অনুসর্গ, লিঙ্গ, ক্রিয়ার কাল ও রূপ, অসমাপিকা ক্রিয়া, যৌগিক ক্রিয়া, প্রত্যয়, সমাস ইত্যাদি। এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে বলা যায় যে, বরেন্দ্রী উপভাষায় রচিত 'মন্ত্রশক্তি' নাটকের ব্যবহৃত সংলাপের মধ্যে রূপতত্ত্বের যে বৈশিষ্ট্যগুলি পরিলক্ষিত হয়। সেই সবের কিছু নিদর্শন তুলে ধরছি—

১. এতদ্ অঞ্চলের এই উপভাষায় কারক ও পুরুষভেদে সর্বনামের পূর্ণাঙ্গ ও বিচিত্র ব্যবহার লক্ষিত হয়।

কর্তৃকারকে সর্বনামের রূপ নিম্নে উদ্ধৃত করা হল—

পুরুষ	**একবচন**	**বহুবচন**
উত্তম পুরুষ	মুই/মোর/মোক	আমাহরের/মোরা
মধ্যম পুরুষ	তুই/তোর/তোক	তোরা/তোমাক/তোদের
প্রথম পুরুষ	অর/অক/অয়/অয়তো	অরা
ক. নিকট নির্দেশক (সমীপ্যবাচক)	সিটাই, সিটা, সিটাই, ইটাইতো	এলা, সিলা
খ. দূর নির্দেশক (দূরত্ব বাচক)	উটা, ওই	

সর্বনামের প্রকৃতি	**একবচন**	**বহুবচন**	**নিরপেক্ষ বচন**
গ. অনির্দিষ্ট ও প্রশ্নাত্মক			কি, কে, কেরে
ঘ. পরিমাণ নির্দেশক			কটা, কেছু/কেচ্চু/কিচ্ছু/ কেচুই, এনা/এ্যানা, এত/ এতগুলান, কত, একটু, শতেক, তেভাগা
ঙ. স্থান নির্দেশক			এটা/এটে, কোটে, ওইখানে, ইখানে, সিখানে।
চ. সময় নির্দেশক			এ্যাদ্দিন, এ্যাতদিন, সিদিন, সকালত, সইন্ধ্যা বেলাত, ক'টা, গত হপ্তায়, গতবার, ভরদিন, ইবার, সিবার, রাত-দুপুর, দিন

তামান, এক প্রহর তক, এতো
রাইতে, সারা রাইত, খানিক,
খানিক বাদে।

২. কারক ও বিভক্তি:

এই নাটকের মূল পাঠ্যাংশের মধ্যে থেকে এই উপভাষায় ব্যবহৃত কর্তা, কর্ম, করণ, অপদান, সম্বন্ধ ও অধিকরণ কারকের দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি।

ক. কর্তৃকারক :

'শূন্য' বিভক্তি— পোদ্দার হছে আসল হারামি।
সামসের ওই রাতে কালিপুরে মিটিং।
যশোদা দিদি অক ধরায় দেয় না ক্যান।

'র' বিভক্তি— হামার কেচু করার নাই।

খ. কর্মকারক:

প্রধানত 'ক' বিভক্তি— মোক মানাই নাইগবে।
পুলিশক অয় নাচায়ে বেড়াছে।
অক ধরায় দিলেই হয়।
সামসেরক খুইজে নিয়া আসি।

'কে' বিভক্তি— চৌকিদারকে একবার ডাকুনতো।
সামসেরকে ধরতেই হবে।

'শূন্য' বিভক্তি— তেভাগা হবে না।
যাত্রা কি আরম্ভ হয়ে গেছে নাকি?
কলমীশাক যা রাধিছু তা কি কমো।

'এর'- বিভক্তি— আমাদের কেউ বোকা বানাচ্ছে।

গ. করণ কারক:

'ত' বিভক্তি— শালা তেভাগার জ্বালাত রাতের ধান্দাও বন্দ হবা বসিছে।

'দি' (দিয়া) অনুসর্গ— সুখটান দিয়া বাড়াই।

ঘ. অপদান কারক:

'তে' বিভক্তি—

'থাকি' (থেকে) অনুসর্গ— আকাশ থে পরলু যে।

চোখর থে আলো সরা ভাই বিন্দা

যা আইবির হাতথে বাড়াইছি।

মুই বুড়া মানুষটা নদী সাইতরে ওপার থে নৌকা নিয়া আনু।

ঙ. অধিকরণ কারক:

'শূন্য' বিভক্তি— আজ তিনমাস হইলো গাঁওত শুরু হইচে এক হজ্জুত।

দিনভর পোকরের পানা সাফ করালো।

শালা দিনভর পানা ঘাইটে সারা গাও চুলকাছে।

'এ' বিভক্তি— শালা সোমবারে কাম শনিবারে মজুরি।

'ত' বিভক্তি— রাইতভর আধারত থাইকপু?

শনিবারে হাটত যাইম।

সব মুখত চাবী আইটে যে যার কাম করোছে।

মনত হয় তোর হাতত চুমা খাই।

সইন্ধা বেলাত কনু বাবু ট্যাকাটা।

চোরের ঘরত চোর ঢোকে না।

'র' বিভক্তি— বাড়ির ভিতর থাকিস।

রাত তিনটার আগে কেউ শালা বিছানাত যাবে না।

'এর' বিভক্তি— দিনের বেলায় কেচ্চু ঠাহর পাইবি না।

চাষীগুলানের বাড়িত তো আর সিঁদ কাইটপা না।

দেশের শত্রু তো।

'য়' বিভক্তি— এক জায়গায় স্থির থাকে ভাবিছু?

চ. সম্বন্ধ পদ: এই উপভাষায় 'র', 'এর' বিভক্তি রূপে বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

'র' বিভক্তি— নদীর ঘাটত নৌকা নাই।

তেভাগার ধান কাইটতে অনেক অনেক মানুষ দরকার।

'এর' বিভক্তি— সামসেরের চ্যালা হচে।

গরিবের বন্দু হওয়া বড় জ্বালা।

রসুলের বিরক্ত কণ্ঠ শোনা যায়।

৩. উপসর্গ:

অর্ধ-তৎসম : প্র > পো— পরনাম, পরথম

প্রতি — পিতিশোধ।

বাংলা: অ- অমান্য

বিদেশী: বে > ব্যা— ব্যাবাক, বেকার, বেকুব, বেহুদ্দা

৪. **অনুসর্গ:** এতদ অঞ্চলের উপভাষায় অনুসর্গের বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

পাছৎ— ১. মারুক, ধরুক, অপমান করুক, পাছত নাগুক, ... জাইনবা, গরীব মানুষ তোমার বন্ধু।

২. চাচা, মোরা গাওর ব্যাবাক গরিব মানুষ তোমার পাছত আছি।

৩. ফির পুলিশ, দারোগা আমাহরের পাছত সরকার আছে।

তনে/তানে, তংকে—

১. অয়তো চাষীগুলানক তেভাগার তংকে খেপাচ্ছে।

২. আপনার তংকেই পোকরে জাল ফেলাইলাম।

৩. ঘাট পারাপার তংকে মানুষজন বুঝি বইসে আছে।

৪. আইজ চুরি কইরবা যাছিস ব্যাবাক মাইনষের তংকে ... ইয়াত কুন পাপ নাই।

পাকা/পাকে (< পক্ষ) অর্থ দিকে — যি দিক মন চায় চলে যামো।

৫. লিঙ্গ: লিঙ্গের ব্যবহার এই উপভাষায় লক্ষ করা যায়।

স্ত্রীলিঙ্গ বাচক প্রত্যয় হল— ই/ঈ, নী

স্ত্রীলিঙ্গ নির্দেশক শব্দ বা পূর্বপদ হল—বেটি, মিয়া।

স্ত্রীলিঙ্গ বাচক— ই/ঈ- দিদি চাচি, মাসি, মাগী ইত্যাদি।

নী-ধোপানী

'মিয়া' শব্দটি পূর্বে যোগ করে স্ত্রী প্রাণী বোঝানো হয়। যেমন— মিয়ামানুষ।

পুংলিঙ্গ নির্দেশক প্রত্যয় হল— 'আ'।

পুংলিঙ্গ নির্দেশক শব্দ বা পূর্বপদ হল— 'মরদ'।

পুংলিঙ্গ বাচক প্রত্যয়— 'আ' = ছোরাটাক/ছোরাটা, বুড়া, বাবা/বাপ/বাজান, চাচা, বেটা/ব্যাটা, চ্যাংড়া, ভাতিজা।

৬. বচন :

একবচন নির্দেশক বিভক্তি হল— ট, টা, খান।

প্রাণীবাচক শব্দে— ট, টা ব্যবহৃত হয়। যেমন— মানুষটা, লোকটা ইত্যাদি।

বস্তুবাচক শব্দে — খান যুক্ত হয়। যেমন— নৌকাখান।

বাক্যে প্রয়োগ: যেমন— তোমার নৌকাখান আমাহরের দরকার।

বহুবচনের বিভক্তি হল— লা। প্রাণীবাচক বহুবচন রূপে অনেক সময় সাধুভাষায় 'গুলি' এবং চলিত বাংলায় 'গুলো' বা 'গুলা' শব্দের যোগ হয়।

যেমন— চাষীগুলান/চাষাগুলান, বর্গাদারগুলান/বর্গাদারগুলা, শিয়াল গুলান, সেপাইগুলো ইত্যাদি।

বাক্যেপ্রয়োগ: উদিক চাষীগুলানক নেইংটা করেছে রজব আলী আর মুখুটি।

তে তেভাগা তংকে বর্গাদারগুলান যি আওয়াজ তুলিছে, সিটিও অন্যায় নয়।

ওফ! সিপাইগুলো যে কী করছে!

৭. ক্রিয়ার কাল ও রূপ:

এখানে প্রসঙ্গত বলা যায় যে, এই 'মন্ত্রশক্তি' নাটকের মূল পাঠ্যাংশের সংলাপ বা কথোপকথনের পরিসরে মূলত এই উপভাষায় কাল ও পুরুষভেদে উভয় বচনে কিছু ক্ষেত্রে পৃথক ক্রিয়াবিভক্তির প্রয়োগের পূর্ণাঙ্গ রূপ খুব একটা পাইনি জন্য এই উপভাষার ক্রিয়ার কাল ও রূপভেদ সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ রূপ তুলে ধরা যায়নি।

৮. প্রযোজক ক্রিয়া: এই উপভাষায় প্রযোজক ক্রিয়ার ব্যবহার দেখা যায়। মূল ধাতুর সঙ্গে প্রথমে 'আ' যোগ করে তার সঙ্গে ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত করে প্রযোজক ক্রিয়া গঠিত করা হয়। যেমন— দেখাছে।

বাক্যেপ্রয়োগ: যেমন— ঢং দেখাছে।

সূত্র— ধাতু + আ + ক্রিয়াবিভক্তি।

যেমন— দেখ্ + আ + ছে = দেখাছে।

৯. সমাস: 'মন্ত্রশক্তি' নাটকের সংলাপের মধ্যে এই উপভাষার দ্বন্দ্ব, তৎপুরুষ, কর্মধারায়, দ্বিগু ও বহুব্রীহি সমাসবদ্ধ পর্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ সেইসব সমাসবদ্ধ পদের কিছু নিদর্শন তুলে ধরছি।

দ্বন্দ্ব সমাস: যেমন— রাত ও দুপুরে = রাত-দুপুরে, দ্বন্দ্ব সমাস।

পোকা ও মাকর = পোকা-মাকড়, দ্বন্দ্ব সমাস।

হাঁটা ও হাটি = হাঁটাহাটি, দ্বন্দ্ব সমাস।

কান্না ও কাটি = কান্নাকাটি, দ্বন্দ্ব সমাস।

উল্টো ও পাল্টা = উল্টোপাল্টা, দ্বন্দ্ব সমাস।

লোক ও জন = লোকজন, দ্বন্দ্ব সমাস।

তৎপুরুষ সমাস: যেমন— বর্গার দার = বর্গাদার, সম্বন্ধ তৎপুরুষ সমাস।

চৌকির দার = চৌকিদার, সম্বন্ধ তৎপুরুষ সমাস।

খেয়া পারাপারের নিমিত্ত যে ঘাট = খেয়াঘাট, নিমিত্ত তৎপুরুষ সমাস।

সুখের নিমিত্ত টান = সুখটান, নিমিত্ত তৎপুরুষ সমাস।

বসতের নিমিত্ত যে বাড়ি = বসতবাড়ি, নিমিত্ত তৎপুরুষ সমাস।

কর্মধারয় সমাস: যেমন— তিনভাগের সমাহার = তেভাগা, দ্বিগু সমাস।

বহুব্রীহি সমাস: যেমন— অবধানের সহিত বর্তমান = সাবধান, সহার্থক বহুব্রীহি সমাস।

১০. প্রত্যয়:

কৃৎ ও তদ্ধিত এই দুই প্রকারের প্রত্যয় এই উপভাষায় লক্ষ করা যায়। 'মন্ত্রশক্তি' নাটকের সংলাপের মধ্য থেকে তাঁর কিছু নিদর্শন নিম্নে দেখানো হচ্ছে।

কৃৎপ্রত্যয়: প্রত্যয়গুলি হচ্ছে— আ, আল্, ইল্, ইয়ে, অন।

আ — ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য— যা + বা = যাবা। যেমন— নাতে মোক যাবা দি।

এইরূপ— বস্ + আ = বসা, ডাক্ আ = ডাকা।

ক্রিয়াবাচক বিশেষণ— ধর্ + আ = ধরা।

অন— বাঁচ্ + অন = বাঁচন, যেমন— ঠিকই কছিস রে, গরীবের বাঁচন নাই।

ইয়ে— বস্ + ইয়ে = বসিয়ে > বইসে, যেমন— ইখানে বইসে দু' বোতল হোক ... তারপর ফির ...।

এইরূপ — কহ্ + ইয়ে = কহিয়ে > কইয়ে/কইলে

কর্ + ইয়ে = করিয়ে > কইরে।

ধর্ + ইয়ে = ধরিয়ে > ধইরে।

তদ্ধিত প্রত্যয়: এর প্রত্যয়গুলি হচ্ছে— ই, উ,তি, আল, আলে, আলি, ইয়া, উয়া, মান্, বান্ প্রভৃতি।

ই— জনমজুর + ই = জনমজুরি।

যেমন— তোর মত বয়েস কি আছে মোর যে দিনে-জনমজুরি খাটমো, রাইতে সিঁদ কাটমো?

এইরূপ— হারাম + ই = হারামি, চালাক + ই = চালাকি।

আল/য়াল— মাত + আল = মাতাল।

যেমন— ভোর রাইতে দুই মাতাল টইলতে টইলতে বাড়ীত ফিরা যায় মরা মানুষের মত।

এইরূপ— প্যাচ + আল = প্যাচাল, লাঠি + আলা = লাঠিয়াল > ল্যাঠ্যাল।

উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ মহকুমার জেলা সদর শহর রায়গঞ্জের অন্যতম ও উল্লেখযোগ্য গ্রুপথিয়েটার সংস্থা 'ছন্দম'-এর প্রতিষ্ঠা লগ্নের বিশিষ্ট নট ও নাট্যকার তথা নাট্য-নির্দেশক অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় পরিতোষ চন্দ্র গুহের রচিত মূলগল্পের কাহিনী অবলম্বন করে 'গোধূলি' নাট্যরূপ দিয়েছেন। এই নাটকের পটভূমিতে লক্ষ করা যায় উত্তর দিনাজপুর জেলার গ্রাম নির্ভর তথা মফস্বলকেন্দ্রিক থানা কালিয়াগঞ্জের শ্রীমতি (ছিরামতি) নদীর উপর সেতু নির্মাণের কাজকে কেন্দ্র করে সেই অঞ্চলের গ্রামীণ সাধারণ অসহায় গরীব মানুষেরা কৃষিকাজ থেকে সারাবছর ভরণপোষন স্বাভাবিকভাবে না হওয়ার সুবাদে বাধ্য হয়ে তারা চৌধুরী ঠিকাদারী ফার্মে দিন মজুরীর কাজে যুক্ত হয়েছেন। অর্থাৎ গ্রামের নিরীহ মানুষদের অভাবতাড়িত দৈনন্দিন জীবন-যাপনের নিদারুণ কষ্টকর জীবনের এক বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে। এই নাটকের কাহিনীর শুরুতে কেন্দ্রীয় বা মূল চরিত্র গোধূলী পরিবারের অভাবের কারণে বিশেষ করে অসুস্থ স্বামী হরোর চিকিৎসা এবং একমাত্র পুত্র বিছানুকে মানুষ করে তোলার জন্য স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে উক্ত ঠিকাদার ফার্মে রেজিনের কাজ করে সংসার চালাতে বাধ্য হয়। কিন্তু অভাবের যন্ত্রণায় জর্জরিত এইসব সাধারণ গরীব যুবতী রেজিনদের সুবল চৌধুরীর ঠিকাদারী ফার্মের বিশ্বস্থ কর্মচারী নিখিল কর্মকার তাদের বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে শোষণ করে সর্বস্বান্ত করে এবং কখনো এদের মান-ইজ্জত নিয়েও টানাটানি করে। সেই সঙ্গে এই ঠিকাদারী ফার্মের মালিক সুবল চৌধুরী এই সেতু তৈরির কাজে কিভাবে অফিসের আমলাদের হাতে করে উন্নয়নমূলক অর্থ আত্মসাৎ করে এবং দেশে রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষী বুদ্ধিজীবীরাও দেশের সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে সর্বদাই নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিমগ্ন থাকে তা পরিস্ফুটিত হয়েছে। পরিশেষে এই নাটকের পরিণতিতে দেখা যায় গৃহবধূ রেজিন গোধূলি সংসারের অভাবে নিষ্পেষিত হয়ে স্বামীর চিকিৎসার জন্য নিখিল কর্মকারের কাছ থেকে দুই হাজার টাকা ধার চায়। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে নিখিল গোধূলির জমি (ভিটা) বন্ধক নিয়ে দুই হাজার টাকা ধার দেয় বটে কিন্তু নিষ্ঠুরভাবে এই গ্রাম্য অসহায় গৃহবধূর মান-ইজ্জত লুটে তাকে নিঃস্ব করে তুলেছিল। এর পরিণামে স্বামী হরোর নির্দেশে গ্রামের মানুষ সংঘবদ্ধ হয়ে তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সমবেত ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

নাট্যকার অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় এই 'গোধূলি' নাটকে গ্রামের অতি সাধারণ গরীব মানুষদের অভাব ও দুঃখ-দৈন্য ক্লিষ্ট বাস্তব অথচ করুণ জীবন-কথা এতদঞ্চলের বহুল প্রচলিত কথ্যভাষা বিশেষত রাজবংশী আঞ্চলিক ভাষায় সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই নাটকটি কলকাতার গ্রুপ

থিয়েটার পত্রিকায় (৩৭ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ২০১৫ খ্রি:) প্রকাশিত হয়ে যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করে। এই 'গোধূলি' নাটকের কাহিনীর সংলাপ বা কথোপকথনের মধ্যে এই অঞ্চলের রাজবংশী আঞ্চলিক ভাষার নিদর্শনস্বরূপ অভাবের তাড়নায় ক্লিষ্ট অতি দরিদ্র গৃহকর্তা হরো ও তার স্ত্রী গোধূলির কথোপকথনের (১ম দৃশ্য, পৃ. ৭৩-৭৪) কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি—

গোধূলি : তুমরা ফের মদ গিলি আসিহা?

হরো : ওইলা ফির না কহেন। মদ নাই খাও পেস্‌সাদ, বয়া কালীর পেস্‌সাদ। (গোধূলি কড়াই নামিয়ে উঠে আসে— আজ একটা হেস্তনেস্ত করবে বলে।)

গোধূলি : ওই পেস্‌সাদ গিলি তো শরীল-সংসার সব শেষ করি ফেলালেন। কাম কাজ করবা পারেননি। মোক রেজিন খাটি সংসার চালাবা হছে। তুমার ওষুদ কিনবা হছে। ইটা তুমার হুস নাই।

হরো : খবরদার গোধূলি। মোকে ভাতের খোটা দিবি না কই দিনু। তোকে মুই রেজিন খাটবা মানা করি, তুই যাস কেনে? মরদ কুলিকামীন আর মিস্ত্রিগুলার সাথে মসকরা, ঢলাঢলি মোর ভালো লাগেনি। শ্যেষমেষ তুই একটা ছিনাল হই গেলু।

গোধূলি : ছিঃ ছিঃ মোক ছিনাল কহছেন। পেটের লাগি গতর খাটি কামাই— উয়াৎ কুনো দোষ নাই। হায় ভগবান। মুই গাওৎ আগুন দি মরি যাম। (হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। বিছানু ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে সব দেখছিল। বেড়িয়ে এসে—

বিছানু : মাও রে, তুই কেনে রেজিনার কাম করবা যাছু। মোর ভালো লাগেনি। তোক কাম করবা হবেনি। মুই কুন্ডমণ্ডিত চায়ের দোকানত কাম করমো।

গোধূলি : না, তোর কাম করবা হবেনি। নেখাপড়া করবার হবে। ইস্কুলতো যাবা হবে। তোর বাপটাক কহ কামকাজ করিবার। শুনিছু মোক ছিনাল কহছে।

হরো : এই দ্যাখ! তোক মুই ছিনাল কহবা পারি? গাঁয়ের মানুষগুলান খারাপ খারাপ কথা কহছে। আয় মোর কাছৎ আয়। (হরো গোধূলিকে কাছে টেনে নিতে যায়)

গোধূলি : মোক ছাড়ি দেন। মাতালক মোর ভালো লাগেনি। (আজ আর আত্ম সমর্পণের কোন ইচ্ছে নাই গোধূলির। প্রাণপণ চেষ্টায় ও হরোকে ঠেলে দিল। পড়ে যেতে যেতে বারান্দায় খুটি ধরে নিজেকে সামলে নিল। মুহূর্তে হরোর মাথায় খুন চেপে গেল। ঠাস করে গোধূলির গালে একটা চড় কসিয়ে বলল)

হরো : যান, চলি যান। জেঠি তোমার পিরিতের লোকছে, সেঠি চলি যান।

বিছানু : হেই বাপো, তুই মাক মারলু ক্যেনে? দিনমান রোজ রোজ ঘরত কাজিয়া মোর

ভালো লাগেনি। মুই তিনুক খিলাবা যাছু। (বিছানু বেড়িয়ে যায়)

গোধূলি : তোমরা মোর গাওৎ হাত দিলেন ক্যেনে? তুমার সরম লাগেনি। গাওৎ হাত তুলেন?

হরো : মোর কথা ধরিসনি। ওইথানে মার খালু বেয়াড়া গরুটাক মারো— বেয়াদপ মাগিটাক মারি ইয়াত কুনো দোষ নাই।

গোধূলি : কী কহিলেন? মুই তোমার গরুছাগল? মুই ওইলা না হয়। তোমার ঘরৎ মুই কিল খাবা আসিনু? তোমরা থাকেন তোমার গরু ছাগল নিয়া। মুই চলি যাছু—

হরো : বুঝি সুঝি কথা কহিস গোধূলি। বেটিছাওয়া তুমার এত্তো দেমাক। মোক ছাড়ি যাবা চাহিছিস। তো যা লি যা। কোনঠিনা যাবু? কার ঠিনা?

গোধূলি : তোমাক কহি যাবার মোর দরকার নাই। চোখ যেঠিনা যাবে সেঠিনা যামো। ঠেকাবা পারবেন তুমরা।

হরো : যামো কহিলেই হইলো? মুই তোর ভাতার মোর অধিকার ছে তোক শাসন করিবার।

গোধূলি : নিছে। কোন অধিকার নিছে। ভাত-কাপড় দিবার খেমতা নিছে। মদ গিলা পেটৎ ঘা করিলেন। ঘর গেরস্থির মুরাদ নাই। বউ-বেটাক খাবার দিবার পারেননি। ভাতারের অধিকার দেখাছেন। তুমরা থাকেন তুমার অধিকার নিয়া। মুই হিতি থাকিম নাই। চলি যাম। (গোধূলি ঘরে ঢোকে। কিছুক্ষণে মধ্যেই একটি পোটলা হাতে বেরিয়ে আসে। এমন সময় বিছানু এসে প্রবেশ করে। এবং এককোণে গিয়ে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।)

গোধূলি : হ্যাঁ, মুই চলি যাছু।

হরো : চলি যাছেন তো এক্কেবারে চলি যান। চলি যাওয়া যত সহজ ঘুরি আসা তত সহজ না হয়, ইটা মনে রাখিস গোধূলি।

গোধূলি : কেনে ফিরে আসমো। মোর বাপ-মাও ছে। মুই বেজন্মা না হয়। তোমার ঘরৎ মুই ফির কিলচড় খাবা আসমো। সুখে থাকেন তোমরা।

হরো : আরে, বেয়াদপ ইস্তিরিক মারি কুনো দোষ নাই। বেয়াদপি কইরলে ফির মার খাবা হবে। ইটা মুই কহি দিনু।

গোধূলি : গোধূলিক একবার পিটাবা পারলেন। আর কুনো দিন পিটাবা পারবেন নি। মুই এক্কেবারে চলি যাছু।"

এরপর চতুর্থ দৃশ্যের (পৃ. নং ৮০-৮১) চৌধুরী ঠিকাদার ফার্মের বিশ্বস্ত কর্মচারী নিখিল কর্মকারের সঙ্গে গোধূলির কথোপকথনের কিছু অংশ তুলে ধরছি—

কর্মকার : ''কী গোধূলি, আইজ তোমার এতো দেরি হইল যে, কাম কাজ করিবার মন নিছে?

গোধূলি : মুই কি ইচ্ছা করি দেরি করনু। বিপাকে আছি মুই। দেরি তো হবারই পারে।

কর্মকার : তা পারে। বিপদ তো তোমারই ছেই, নতুন করি তুমার আবার কোন বিপদ হইল কহেক। দেখি তুমার মুশকিল আসান করবা পারি কি না?

গোধূলি : ওইলা কথা ফির ছাড়ি দেন। হাজিরার কথা কহেন। কাম জুটিবে, না নাই?

কর্মকার : হাজিরার কাম তো আইজকার মতো খতম হই গিছে। তুমার আশাৎ থাকি থাকি দশটা পার হয়া গেলে বুঝনু তোমার আইজ আসা হবেক নাই।

গোধূলি : আগড়ম বাগড়ম ছাড়ি সুজা কথা কহেন— আইজ কাম মিলবে কি না মিলবে?

কর্মকার : গোধূলি তোমাক মুই ফিরাবা পারি? সাইটৎ না হয়। মোর ঘরৎ দিনমান থাকি কামকাজ করি যাও।

গোধূলি : মুই চলনু। ঘরে কাম করমো নাই। মুই কিষাণ বেটিছয়া। খাটে খাও। কাম করি পয়সা কামাই। গতর বেচি সোহাগ কামাই না।

কর্মকার : পেট সে কথা মানিবেক? এ কুনো বিবেচনার কথা হইল? ভাবি দেখেন, ঘরে তুমার ছোয়া, বিমারি স্বামী। খালি হাতৎ ঘর যাবা চাহেছেন? উস্মার মুখৎ তুলি দিবার মতন কিছু ছে ঘরৎ বুঝি দেখেন? বুদ্ধি বিবেচনা কি তমোমনাশ করি ফেলালেন। (গোধূলি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে।)

গোধূলি : তোমার ঠিনৎ দশ ট্যাকা ধার চাইছি মুই। মোক ধার দিবা হবে। কাল দরমা পালি হানে শোধ করি দিমো।''

উপরের উদ্ধৃত সংলাপ বা কথোপকথন এবং মূল পাঠ্যাংশের উপর ভিত্তি করে এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মুখে বহুল ব্যবহৃত কথ্যভাষা মূলত রাজবংশী আঞ্চলিক ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার প্রয়াস করছি।

৪.২.১ ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য:

এতদঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষায় লক্ষ করা যায় মান্য চলিত বাংলা ভাষার মতো মূল স্বরধ্বনিগুলি বজায় আছে। যথা— অ, আ, ই, উ, এ, অ্যা, ও। উচ্চারণের সময়ে এই স্বরধ্বনিগুলির বিশেষ করে শব্দের আদিস্থানে, মধ্যস্থানে ও অন্ত্যস্থানে মাত্রাগত কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আবার এই উপভাষার প্রায় সব ব্যঞ্জনধ্বনি যা চলিত বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয় এবং এই সব ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির মধ্য থেকে কিছু ধ্বনির উচ্চারণের ক্ষেত্রে পার্থক্য লক্ষণীয়। তাই স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণগত পার্থক্যের নিরিখে এই অঞ্চলের কথ্যভাষা তথা রাজবংশী আঞ্চলিক ভাষার বিশেষ

কিছু আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। ১. এতদঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষায় অন্ত্য 'অ' অনেক সময়, বিশেষত ক্রিয়াপদে উচ্চারিত হয় না বা লোপ পায় (অতীত ও ভবিষ্যৎকালে)। যেমন— গেল > গেল্। বাক্যে প্রয়োগ: কেনে ফোম হারায়ে গেল্? ২. এই আঞ্চলিক ভাষায় কখনো কখনো অপিনিহিতি জাত 'ই' ধ্বনির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যেমন— আইজ < আজ, হইল < হল, কইরা < করা। বাক্যে প্রয়োগ: আইজ কাম মিলবে কি না মিলবে? এ কুনো বিবেচনার কথা হইল? আপনি কি মুখস্ত কইরা ফ্যালছেন। ৩. এখানে 'এ' ধ্বনি শব্দের আদিতে অপরিবর্তিত রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন— এলা (এগুলি), এহনও (এখনও), এঠিনা/এঠে (এখানে), এতো/এত্ত/এত্তো (অনেক),

৪. আদিতে ও পদান্তে ব্যঞ্জনযুক্ত 'অ্যা' ধ্বনি ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

আদিতে 'অ্যা' : যেমন— ক্যান, ট্যাকা, ফ্যালছেন, শ্যাষ, ক্ষ্যামতা ইত্যাদি।

অন্ত্য 'অ্যা': যেমন— লাই গ্যাই।

৫. আদ্য 'র' এই ভাষায় অপরিবর্তিত থাকে। যেমন— রক্ত, রাইত।

বাক্যে প্রয়োগ: জয়কালী, বাজাতালি, রক্তখাবি, মুণ্ডমালা।

ঠিকে তো এত্তো রাইত, কুনো খবর নাই।

৬. পদান্ত্যস্থিত 'ছ' ধ্বনি এই উপভাষায় 'স' রূপে উচ্চারিত হতে দেখা যায়। যেমন—

কোরিছ > কোরিস/করিস,

ধোরিছ > ধোরিস/ধরিস।

বাক্যে প্রয়োগ : কেনে রাগ করিস।

মোর কথা ধরিসনি।

৭. পদান্তেও অনেক সময় অতিরিক্ত 'হ'-এ উচ্চারণ এই আঞ্চলিক ভাষায় পরিলক্ষিত হয়। যেমন—

আসিহা, থাকিহা, লাগিহা, বেচিহা, ট্যেহা।

বাক্যে প্রয়োগ: তোমরা ফের মদ গিলি আসিহা?

আর সন তো তুই থাকিহা তামাম রাত্তির বাপটোর ঘরৎ।

কিমন লাগিহা বাপটার সুহাগ?

বাড়িঘর তামাম বেচিহাও কুল পাবেননি।

ট্যেহা লাগিবে মজান।

উত্তর দিনাজপুর জেলার রাজবংশী আঞ্চলিক ভাষায় স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণের দিক থেকে যে নানা প্রকারের পরিবর্তন ঘটে থাকে ভাষাতাত্ত্বিক ধ্বনি পরিবর্তনের সূত্র অনুযায়ী সেগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

১. এই জেলার আঞ্চলিক ভাষায় অপিনিহিতির ব্যবহার অপেক্ষাকৃতভাবে কম লক্ষ করা যায়। অপিনিহিতির কিছু নিদর্শন:

ক্রিয়াপদে— আইসা, আইজকার, কইরা, কইছে, খাইছে, কইছেন, খাইলো, চাইছি, ঢুইকা, দেইখাশুইনা, বুইজা, হইল ইত্যাদি।

২. স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ যুক্ত ব্যঞ্জনকে ভেঙ্গে দূরবর্তী করে তার মাঝে স্বরধ্বনির আগম ঘটায়, তাই এই আঞ্চলিক ভাষায় স্বরভক্তির সূত্র মেনে 'ই' স্বরধ্বনির আগম দেখা যায় এবং 'এ' স্বরধ্বনির আগম ঘটে। যেমন— প্রীতি > পিরিতি/পিরিত, গ্লাস > গিলাস, গ্রাম > গিরাম, আবার ক্ষ্যামতা > খেমতা, প্রতিজ্ঞা > প্রিতিজ্ঞা, ত্রিশূল > তিরশূল।

৩. এই আঞ্চলিক ভাষায় আদি স্বরাগম পরিলক্ষিত হয়। যেমন— স্ত্রী > ইস্তিরি, স্কুল > ইস্কুল, স্পর্ধা > অস্পর্দা, শ্রীমতি > ছিরামতি, সূর্যটার > সূর্যিটার।

৪. স্বরসঙ্গতি ব্যবহার এই আঞ্চলিক ভাষায় পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তী 'ই'-এর কিংবা 'ঈ'-এর প্রভাবে পূর্ববর্তী আ > ই, এ > ই তে পরিণত হয়। যেমন— বেটিছাওয়াল > বিটিছাওয়াল।

বাক্যে প্রয়োগ: ওই বিটিছাওয়ালের মান ভঞ্জন করে আসি।

৫. এই অঞ্চলের রাজবংশী ভাষায় সমীভবনের ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

পরাগত সমীভবন: যেমন— প্রসাদ > পেস্‌সাদ।

বিষমীভবণ: যেমন— শরীর > শরীল

বাক্যে প্রয়োগ: ওই পেস্‌সাদ গিলি তো শরীল সংসার সব শ্যেষ করি ফেলালেন।

তোর হাতত চা খালি শরীল মন সব উচাটন।

৬. এই রাজবংশী আঞ্চলিক ভাষা উচ্চারণকালে শব্দস্থিত ধ্বনির স্থানপরিবর্তন তথা ধ্বনিবিপর্যাস লক্ষ করা যায়। যেমন— পিশাচ > পিচাশ, শরম > সরম।

বাক্যে প্রয়োগ: দশানন পিচাশ জাল ফেলালে তোমার ঘরৎ ।

৪.২.২. রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য:

রূপতত্ত্বের রীতি অনুযায়ী উত্তর দিনাজপুর জেলার রাজবংশী আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে বেশ কতকগুলি স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। সেগুলির ভাষাতাত্ত্বিক বিচার বিশ্লেষণ অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। যথা— সর্বনাম, কারক ও বিভক্তি, উপসর্গ, অনুসর্গ, লিঙ্গ, বচন, ক্রিয়ারকাল ও রূপ, অসমাপিকা ক্রিয়া, যৌগিক ক্রিয়া, প্রত্যয় ও সমাস ইত্যাদি। তবে এতদঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা বিশেষ করে রাজবংশী ভাষায় লিখিত 'গোধূলি' নাটকে বহুল ব্যবহৃত সংলাপ বা কথোপকথনে মধ্যে রূপতাত্ত্বিক যে বৈশিষ্ট্যগুলি পরিস্ফুটিত হয়ে উঠেছে, সেগুলির কিছু নিদর্শন এখানে দেখানো

হচ্ছে।

১. উত্তর দিনাজপুর জেলার এই রাজবংশী ভাষায় সর্বনাম পদের পূর্ণাঙ্গ ও বিচিত্র ব্যবহার লক্ষণীয়। কারক ও পুরুষ ভেদে এই সর্বনামপদের বিচিত্র ব্যবহার দেখা যায়।

কর্তৃকারকে সর্বনামের রূপ তুলে ধরছি—

পুরুষ	**একবচন**	**বহুবছন**
উত্তম পুরুষ	মুই/মোর/হামি	হামার/ হামাক/হামরাও
মধ্যম পুরুষ	তুই/তোর/তোক	তোমার/তুমার/তুমারা/তুমরা
প্রথম পুরুষ	অর, উয়ার, উয়াক, উমার উস্মার ওয়াই	ওরা

সর্বনামের প্রকৃতি	**একবচন**	**বহুবচন**	**নিরপেক্ষ বচন**
ক. নিকট নির্দেশক (সমীপ্যবাচক)	ইটা/সিটা, জেঠি, সেঠি/সিঠাই	ইলায়	
খ. দূর নির্দেশক (দূরত্ব বাচক)	ওই	ওইলা	
গ. অনির্দিষ্ট ও প্রশ্নাত্মক			কি, কী, কায়, কার
ঘ. পরিমাণ নির্দেশক			অত, এত্তো, উয়াৎ, এতোশতো, এত্তোগুলান, অত্ত, কুতো/ কেতো, তামাম, মেলায়
ঙ. স্থান নির্দেশক			ইটে/ইথায়, উঠে, উনটি, উয়াৎ, উহানে, এটে, এইঠে, এঠিনা/ এইঠিনা, কুনঠি/কোনঠিনা, যেঠিনা, সেঠিনা, ঠিনা/ঠিন/ ঠিনৎ, হিতি
চ. সময় নির্দেশক			এত রাতোৎ/এতো রাইত, গেলসন, আরসন, রাতমান, দিনমান, দিনমান।

২. কারক ও বিভক্তি : এতদঞ্চলের এই রাজবংশী ভাষায় কর্তা, কর্ম, করণ, অপদান, সম্বন্ধ ও অধিকরণ কারকের দৃষ্টান্ত এই 'গোধূলি' নাটকের মূল পাঠ্যাংশ থেকে তুলে ধরছি।

ক. কর্তৃকারক: শূন্যবিভক্তি— অতুলবাবু, অত উত্তেজিত হইবেন না।

জ্যাঠা, জানিস তো হরোর অবস্থা ভালো নিছে।

আমি বাড়ি আসিলে ছুটি চলি আসে হামার কাছে।

ধূমাবতী সব খাছে।

'র' বিভত্তি : যেমন— হামার বিছানুর সাথৎ দিনমান খেলে।

খ. কর্মকারক: কে বিভক্তি— তোর ভাতারকে বাঁচাবা হবেনি।

'ক' বিভক্তি — মোক ভুলাবা চাহছেন।

গোধূলি তোমাক মুই ফিরাবা পারি?

নইলে হরোক বাঁচাবা পারমো নি।

গুনিনটাক বিদায় করেক গোধূলি।

শূন্য বিভক্তি— গতর খাটি পয়সা কামাই— উয়াৎ কুনো দোষ নাই।

বিপদ তো তোমার ছেই।

পয়সা কামাবার ধান্দা।

তোর আপদ-বিপদ তো আছে।

গ. করণ কারক:

শূন্য বিভক্তি— কাম করি পয়সা কামাই।

দিয়া অনুসর্গ — লাফ দিয়া কোলৎ উঠে।

ঘ. অপদান কারক:

থাকি/থিকা (থেকে), থিনা— অনুসর্গ।

ওই ইংরেজদের থিকা এইটা জিনিস আমরা খুব ভালো শিখেছি— দুর্নীতি।

ওগো দ্যেশ থিকা তাড়াইছি বটে, কিন্তু ওগো দুর্নীতিটারে আমরা রাষ্ট্রীয়করণ কইরা নিছি।

হাজিরা থিনা শোধ করমো।

এত্তোগুলান ট্যাকা হাজির থিকা শোধ করা যায়?

ঙ. অধিকরণ কারক:

শূন্য বিভক্তি— কুশমণ্ডি হাটখোলাৎ দেখা হইল তোমার মনে নাই?

ছিরামতিৎ স্নান করিলে সব চলি যাছে।

গতর বেচি সোহাগ কামাই না।

আইজ কাম মিলবে কি না মিলবে?

দিনমান কাম করি পঞ্চাশ ট্যাকা দরমা পাচেন।

'এর' বিভক্তি— কালিয়াগঞ্জের ডাক্তার কইছে অপারেশন করাবা হবে।

'ত' বিভক্তি— তোমার ঘরত মুই আর কাম না করিম।

রেজিন হয়া ঘরত কাম .... ?

চ. সম্বন্ধ পদ:

'এর' বিভক্তি— ইটা গাঁয়ের সব লোক জানিহা।

'র' বিভক্তি— তোমার ঘরৎ মুই কিল খাবা আসিনু?

৩. উপসর্গ : উপসর্গের ব্যবহার এই রাজবংশী ভাষায় কম পরিলক্ষিত হয়।

অর্থ-তৎসম: প্র > পো— প্রিতিজ্ঞা, পিরিতি/পিরিতি।

বাংলা: অ, আ— অবাক, অনৈতিক, আতঙ্ক, আদাব।

বিদেশী: বে > ব্যা— বেজন্মা, বেয়াদপ, বেপরোয়া, ব্যাপারী।

৪. অনুসর্গ : এই ভাষায় অনুসর্গেরও ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

কাছত/কাছৎ— আয় মোর কাছৎ আয়।

তুমার এই ভিটার কাগজটো মোর কাছত বন্ধক রাখবা হবে, সুবিধা মতো টাকা শোধ করি খালাস করি নিবেন।

সাথৎ/সাথো/সাথোৎ— খবরদার, ভূতপেত্নীর সাথৎ লড়াই ছেলে খেলা না হয়।

বাপটার সাথো পিরিত করমো নি তো কার সাথোৎ পিরিৎ করমো।

তনে/তানে (তংকে)— তোর তনে মুই তো আছই।

লাগি/লি (লগ্ন)— অর্থ-সঙ্গে, সহিত, কাছে।

বাক্যে প্রয়োগ: তোর লাগি মোর মনত খুবে কষ্ট, খুবে দরদ।

৫. লিঙ্গ: লিঙ্গের ব্যবহার এই অঞ্চলের ভাষায় দেখা যায়।

স্ত্রী লিঙ্গবাচক প্রত্যয় হল— ই/ঈ

স্ত্রীলিঙ্গ নির্দেশক শব্দ বা পূর্বপদ হল— 'বেটি' ও 'মাগী'।

স্ত্রীলিঙ্গ বাচক প্রত্যয়— ই, ঈ: বেটি, বেটিছাওয়া/বিটিছাওয়াল, মাগী/মাগিটাক।

পুংলিঙ্গ বাচক প্রত্যয় হল— আ

পুংলিঙ্গ নির্দেশক শব্দ বা পূর্বপদ হল— 'মরদ'।

পুরুষ বাচক প্রত্যয় — আ: বেটা, বাপটা, ছোয়া, কিষাণ ইত্যাদি।

৬. বচন: একবচন নির্দেশক প্রচলিত বিভক্তি হল— ট, টা, খান।

প্রাণীবাচক শব্দে— ট, টা ব্যবহৃত হয়।

যেমন— ম্যানেজারটা, বাপটা, মাগিটাক, গরুটা, মরদটোক, গুণিনটাক।

বাক্যে প্রয়োগ— ম্যানেজারটার সাথো তুমার পিরিত তো ফির জমি গেল?

বাপটার দুখে তোমার বুকটা ফাটি যাচ্ছে।

বেয়াদপ মাগিটাক মারি—ইয়াত কুনো দোষ নাই।

বস্তুবাচক শব্দে খান যুক্ত হয়। যেমন— ভিটাখান, কৈলজাখান।

বাক্যে প্রয়োগ: ভিটাখান বন্ধকি রাখি দিমো।

কৈলজাখান ফুটা করি ফেলালে সব শ্যাষ।

বহুবচনের বিভক্তি হল— লা।

প্রাণীবাচক ও বস্তুবাচক উভয়ক্ষেত্রেই 'লা' বহুবচন নির্দেশ করে। যেমন— প্রাণীবাচক রেজিনলা।

বাক্যে প্রয়োগ: তোমার সাথৎ রেজিনলা ছে।

প্রাণীবাচক বহুবচনরূপে অনেক সময় সাধুভাষায় 'গুলি' এবং চলিত বাংলায় 'গুলো, গুলা' শব্দের যোগ হয়। যেমন— হামার গুলান, মোরগুলা/মোর গুলান, বাবুগুলা/বাবুগুলান, বউলান, মানুষগুলান, ছাওয়াগুলা, রেজিনগুলা, মিস্ত্রিগুলা ইত্যাদি।

বাক্যে প্রয়োগ: মোরগুলার দোষ ছে, লোভছে।

বাবুগুলান সুযোগ নিছে।

ঘরের বউলানের ভিন পুরুষের সাথে সোহাগ দেখি হামারগুলানের এরও সখ চাগাড় দিছে ফষ্টিনষ্টি করিবার।

৭. ক্রিয়ার কাল ও রূপ: এই 'গোধূলি' নাটকের মূল পাঠ্যাংশের সংলাপ বা কথোপকথনের সংক্ষিপ্ত পরিসরের ভেতর এই রাজবংশী ভাষার ক্রিয়ার কাল ও রূপভেদের বিশেষ করে এই ভাষার কাল ও পুরুষ ভেদে উভয় বচনে কিছু ক্ষেত্রে পৃথক ক্রিয়াবিভক্তির প্রয়োগ রয়েছে, যার পরিপূর্ণ রূপ খুব একটা না পাওয়ায় বচনভেদে ক্রিয়াপদের রূপের পরিবর্তনের পূর্ণাঙ্গ ধারণা তুলে ধরা সম্ভব হয়নি।

৮. অসমাপিকা ক্রিয়া: কখনো কখনো পদান্তি 'ই'-এর সঙ্গে এই ভাষায় অতিরিক্ত একটি অনুসর্গবাচক শব্দ হ্যানে যুক্ত হয়। হ্যানের দ্বারা পূর্ব ক্রিয়াপদের সম্পন্নতা প্রকাশ পায়। যেমন—

পালি হানে (পেলে), সামলায়া হানে (সামলে)।

বাক্যে প্রয়োগ: কাল দরমা পালি হানে শোধ করি দিমো।

মুখ সামলায়া হানে কথা কহিস গোধূলি।

৯. অস্ত্যর্থক ক্রিয়া: এই ভাষায় অস্ত্যর্থক ক্রিয়ারূপে 'আছ' ধাতুর ব্যবহার লক্ষ করা যায়। তবে 'আছ ধাতুর শুধুমাত্র অংশ 'ছ' এর সঙ্গে ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত হয় এবং পূর্ববর্তী 'আ' উচ্চারিত হয় না। যেমন— ছে, ছি, ছু, ছিস, ছিন ইত্যাদি।

বাক্যে প্রযোগ: জেঠি তোমার পিরিতের লোকছে, সেঠি চলি যান।

মোর অধিকার ছে তোক শাসন করিবার।

তিনকুড়ি পাঁচ টাকা কম ছে।

১০. নাস্ত্যর্থক/নঞর্থক ক্রিয়া: নঞর্থক ভাব বোঝাতে এই ভাষায় সব সময় 'নি' ব্যবহৃত হয়।

বাক্যে প্রয়োগ: মুই তোক ছাড়া বাঁচবনি গোধূলী।

কোন অধিকারে নিছে।

ফির মোক ছাড়ি চলি যাবেনি কহেন।

ভিটাখান নি নিবেন?

মুই রেজিনের কামনি করমো।

১১. প্রযোজক ক্রিয়া: প্রযোজক ক্রিয়ার ব্যবহার এই ভাষায় পরিলক্ষিত হয়। প্রথমে মূলধাতুর সঙ্গে 'আ' যোগ করে তার সঙ্গে ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত করে প্রযোজক ক্রিয়া গঠিত হয়। যেমন— দেখ্ + আ + ছে = দেখাছে।

বাক্যে প্রয়োগ: টিভিত দেখাছে।

১২. সমাস: গোধূলি নাটকের সংলাপের মধ্যে এই রাজবংশী ভাষায় দ্বন্দ্ব, তৎপুরুষ, কর্মধারয়, দ্বিগু ও বহুব্রীহি—এই সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। সেইসব সমাসবদ্ধ পদের কিছু নিদর্শন উদাহরণ স্বরূপ তুলে ধরছি—

দ্বন্দ্ব সমাস: যেমন— ভাত ও কাপড় = ভাতকাপড়, দ্বন্দ্ব সমাস

নেখা ও পড়া = নেখাপড়া, দ্বন্দ্ব সমাস

বেটি ও ছাওয়া = বেটিছাওয়া, দ্বন্দ্ব সমাস

তৎপরু' সমাস: যেমন— নেই পরোয়া = বেপরোয়া, নঞর্থক তৎপুরুষ সমাস।

নেই আদপ = বেয়াদপ, নঞর্থক তৎপুরুষ।

নয় জন্মা = বেজন্মা, নঞর্থক তৎপুরুষ সমাস।

নয় মানবিক = অমানবিক, নঞর্থক তৎপুরুষ সমাস।

ঠিকার দার = ঠিকাদার, সম্বন্ধ তৎপুরুষ সমাস।

বিশ্বের অয়ন = বিশ্বায়ন, সম্বন্ধ তৎপুরষ সমাস।

ভাত দেয় যে বা যিনি = ভাতার, উপপদ তৎপুরুষ সমাস।

ঘুষ খায় যে = ঘুষখোর, উপপদ তৎপুরুষ সমাস।

কর্মধারয় সমাস: অর্ধভাবে শিক্ষিত = অর্ধশিক্ষিত, কর্মধারয় সমাস।

মহৎ যে জন = মহাজন, কর্মধারয় সমাস।

যা গত হয়েছে = বিগত, মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস।

ভোগ নামক যে বাদ = ভোগবাদ, মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস।

দ্বিগু সমাস: তিনটি শুলের সমাহার = ত্রিশূল/তিরশুল, দ্বিগু সমাস।

বহুব্রীহি সমাস: দশ আনন যার = দশানন, বহুব্রীহি সমাস।

ধব (স্বামী) নেই যার = বিধবা, বহুব্রীহি সমাস।

১৩. প্রত্যয়: কৃৎ বা ধাতু প্রত্যয় এবং তদ্ধিত বা শব্দ প্রত্যয়ের ব্যবহার এই আঞ্চলিক ভাষায় দেখা যায়। এই নাটকের সংলাপ থেকে উক্ত কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়ের কিছু নিদর্শন দেখানো হচ্ছে—

কৃৎ প্রত্যয়: প্রত্যয়গুলি হল— আ, আল্, ইল্, ইয়ে।

আ— 'আ' প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষ্য ও বিশেষণ হয়। ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য— যা + আ = যাবা। যেমন— মাওরে, উয়াক চলি যাবা কহেন। এইরূপ—

নি + আ = নিবা

কর্ + আ = করা

খা + আ = খাবা

ইয়ে— খান + ইয়ে = খাইয়ে/খাইছে।

যেমন— তবে অনেকেই সুযোগ বুইজা পাল্টি খাইছে।

তদ্ধিত প্রত্যয়:

প্রত্যয়গুলি হল— ই, উ, তি, অলি, অলো, আল, ইয়া, উয়া, মান্, বান্ প্রভৃতি।

ই' গরীব + ই = গরিবি, পাগল + ই = পাগলি, ব্রহ্মদত্ত + ই = ব্রহ্মদত্তি, বিমার + ই = বিমারি।

আল/য়াল— ছাও + আল = ছাওয়াল।

শব্দ ভাণ্ডার:

ভাষার ধর্মই হল নদীর গতিধারার ন্যায় নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ক্রমশ এগিয়ে চলা। অর্থাৎ ভাষা কখনই অনড়, অচল থাকে না বরং নিত্য পরিবর্তনশীল। সেই সুবাদে দক্ষিণ ও উত্তর

দিনাজপুর জেলার উপভাষার গতিধারাও তার ব্যতিক্রম নয়। এতদ্ অঞ্চলের উত্তরাংশের ভাষায় রাজবংশী ভাষার প্রভাব পড়লেও দক্ষিণাঞ্চলের প্রায় অধিকাংশই একেবারেই বরেন্দ্রী ভুক্ত। এই জেলাদ্বয়ের উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ ভাণ্ডার বা শব্দ সম্ভার মূলত শিষ্ট বা মান্য চলিত বাংলার মতোই তৎসম, অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দ দিয়ে গড়ে উঠেছে। এই অঞ্চলে চলিত বাংলায় ব্যবহৃত তৎসম শব্দগুলি প্রায় অর্ধতৎসম রূপে উচ্চারিত হয়ে থাকে। তবে কখনো কখনো যুক্ত ব্যঞ্জনহীন সহজ উচ্চারিত তৎসম শব্দের ব্যবহারও দেখা যায়। এই জেলার বৃহত্তম রাজবংশী জনসমাজ তাদের কথ্যভাষায় প্রচুর তদ্ভব শব্দ নিজস্ব উচ্চারণের মধ্য দিয়ে ব্যবহার করে থাকেন। সেই সঙ্গে তাদের ব্যবহৃত কিছু কিছু শব্দের সঙ্গে ভোট-চীনিয় শব্দের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। এমনকি এই উপভাষায় অষ্ট্রিক গোষ্ঠী থেকে উৎপন্ন যে সব শব্দ চলিত বাংলায় দেশী শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, সেই শব্দগুলিও অল্পবিস্তর ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও এখানকার আর একটি গরিষ্ঠ অংশ হল মুসলমান জনসমাজ, এই বাচক গোষ্ঠীর বাক্য বিনিময়ের মধ্যে আরবী ও ফারসী শব্দের যথেষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বিহার থেকে আগত হিন্দি, মৈথিলী, ভোজপুরী বিভিন্ন বাচক গোষ্ঠী এই দুই জেলায় বসবাস করার ফলে প্রচুর হিন্দি শব্দ এই ভাষায় পরিবর্তিত ও অপরিবর্তিত রূপে প্রবেশ করেছে। অপরদিকে আধুনিক শহরকেন্দ্রিক সভ্যতার স্পর্শে এই জেলার সাধারণ মানুষের বহুল প্রচলিত কথ্য ভাষায় অনেক ইংরেজী শব্দ গৃহীত হয়েছে— যা মান্য চালিত বাংলা ভাষায় অবিকৃতভাবে উচ্চারিত হয়ে থাকে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় রচিত নাটক বিশেষ করে হরিমাধব মুখোপাধ্যায় কৃত নাট্যরূপ 'দেবাংশী', 'মন্ত্রশক্তি' নাটক দুটিতে এবং উত্তর দিনাজপুর জেলার অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গোধূলি' নাটকের মূল পাঠ্যাংশের মধ্যে এতদ্ অঞ্চলের ব্যবহৃত ভাষায় আঞ্চলিক শব্দের নিদর্শন লক্ষ করা যায়।

শিষ্ট বা মান্য চলিত বাংলার প্রভাবে আঞ্চলিক শব্দগুলি হারিয়ে যাচ্ছে। এতদ্সত্ত্বেও আজও এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মুখে মুখে প্রচুর আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহৃত হয়। যা মান্য চলিত বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। ভাষাগত অঞ্চল রূপে দক্ষিণাঞ্চলের বরেন্দ্রী উপভাষাভুক্ত 'দেবাংশী' ও 'মন্ত্রশক্তি' নাটকে এবং উত্তরাঞ্চলের রাজবংশী ভাষাভুক্ত 'গোধূলি' নাটকে ব্যবহৃত আঞ্চলিক কিছু শব্দ নমুনা হিসেবে নিম্নে তুলে ধরছি।

১. ‘দেবাংশী’— নাট্যরূপ হরিমাধব মুখোপাধ্যায়।

বরেন্দ্রী ভাষাভুক্ত আঞ্চলিক শব্দাবলী	**চলিত বাংলা ভাষা**
চ্যাংড়া/ছইলাটা/ছাওয়াল/ছোড়াক/ছাওয়ালোক	ছেলে
বেটা	ছেলে
মিয়া/মিয়া মানুষ	মেয়ে
বেটি/বিটি/বিটিটা	মেয়ে
বাপ	বাবা
মাও/মাওর/মাতাজী	মা
মরদ/মারদক	পুরুষ
মাইনষের/মুনিষ্যি	মানুষেরা/মানুষ
কোটে/কোটখে/কুটেকার	কোথায়/কোথা থেকে/কোথাকার
কেয়	কে
পিছত/পাছখে	পেছন থেকে
চেচাছেন	চিৎকার করা
থানত	থানের ভিতর
খেরা থানে	মা মনসার ভর ওঠে যে জায়গায়
অমকা	ঐরকম ভাবে
গুণমান/গুণীন	ওঝা/মন্ত্রধারক (গণৎকার)
পইসাওয়ালা	ধনী/বিত্তবান
চৌহদ্দি	সীমানা
প্যাটত/প্যাট	পেট
এনা/এলা	অল্প পরিমাণ
অশোচ	অশৌচ
গিদরা	বাচ্চা ছেলে
এটে	এখানে
ঢুকলু/ঢুকি	প্রবেশ করা
পাতা	যার উপরে মা মনসার ভর ওঠে

রাজবংশী ভাষাভুক্ত আঞ্চলিক শব্দাবলী	চলিত বাংলা ভাষা
জুত	শিক্ষা দেওয়া
ধন্দ	ধাঁধা
হুস	জ্ঞান
মানাগুণা	মেনে চলা
ফিকা দিলেন	ফেলে দেবেন
চিহারা	চেহারা
মাইনবা	মেনে চলা
আমাহরের	আমাদের
ক্ষ্যামা	ক্ষমা
আর্জি	নিবেদন করা
শালা বোগদা	বোকা
দিগদারী	মুশকিল
খোরাকী	বেঁচে থাকার রসদ/খাওয়া পড়া দেওয়া
শুক্যে	শুকিয়ে
ঠেকা	দায়
ওঝা	গুণীন
ঠোকাঠুকি	মারামারি
তামাম	সব

রাজবংশী ভাষাভুক্ত আঞ্চলিক শব্দাবলী	চলিত বাংলা ভাষা
পোটা	সর্দি
বেবাক	সব
গাঁওর	গ্রামের
সিটক্যা	পাতলা
তংকে	জন্য
আওয়াজ	শব্দ
ট্যানে	টেনে
বাজনটা	বাজনাটা

বরেন্দ্রী ভাষাভুক্ত আঞ্চলিক শব্দাবলী	চলিত বাংলা ভাষা
কেরামতি	খেল দেখানো
বুন	বোন
দিশাবার	দেখিয়ে দেওয়া
জুটিছু	উপস্থিত হওয়া
ছ্যাঁচাই	সত্য
ঢিঢ্	টাইট করা/শাস্তি দেওয়া/বেঁধে ফেলা

২. 'মন্ত্রশক্তি'— হরিমাধব মুখোপাধ্যায়

বরেন্দ্রী ভাষাভুক্ত আঞ্চলিক শব্দাবলী	চলিত বাংলা ভাষা
ছোড়া/ছোরাটা	ছেলে/ছেলেটা
বেটা/ব্যাটা	ছেলে
ভাতিজা	ভাইপো
চাচা	কাকা
চাচি	কাকিমা
মিয়া	মেয়ে
বাজান	বাবা
বেটি/বিটি	মেয়ে
বাপ/বাপক	বাবা/বাবাক
চ্যালা	শিষ্য
মাগী	মেয়ে
সোয়াদই	স্বাদ
যাত্তার	যাত্রার
বেবাক/ব্যাবাক	সব
কোটে	কোথায়
এটে	এখানে
সেটে	সেখানে
ক্যামকা	কেমন

বরেন্দ্রী ভাষাভুক্ত আঞ্চলিক শব্দাবলী	চলিত বাংলা ভাষা
ডাইকপা	ডাকা
কোটখে	কোথা থেকে
আলু	আসা
গাঁওত/গাঁওর	গ্রাম
এর্কি	ইয়ারকি
বাতিটা	আলোটা
পিটন	মার দেওয়া
আধাআধি	অর্ধেক
সমতো	সময়
খ্যামতা/খেমতা	ক্ষমতা
ধান্দা	উপায়
সিঁদ	চুরি করার জন্য গৃহ-প্রাচীরে কৃত গর্ত
হুজ্জুত	গণ্ডগোল
কওয়া	বলা
শুতি	শুয়ে
জিতপে	জিতবে
কমো	বলব
ডুকরে	জোরে চিৎকার করে
জবর/জব্বর	খুব
পাওত	পায়ে
ত্যামকাই	তেমন
পোকর	পুকুর
পামোনা	পারবনা
মন্তরটা	মন্ত্রটা
আওড়ায়	বলে
পরখ	পরীক্ষা
খানিক বাদে	কিছুক্ষণ পরে

বরেন্দ্রী ভাষাভুক্ত আঞ্চলিক শব্দাবলী	চলিত বাংলা ভাষা
হপ্তায়	সপ্তাহ
দিমেন	দেবেন
উপাস	উপবাস
জিউ	জীবন
লম্ফত	লণ্ঠন
দিনভর	সারাদিন
রাইতভর	সারারাত
আধারত	অন্ধকার
ঢুকে/ঢকপু	প্রবেশ করা
সুদা হাতে	খালি হাতে
খাইটে/খাটে খুটে	পরিশ্রম করে
আওছে	আসছে
ফাটকত	জেলখানা
বোগদা	তুচ্ছার্থে সম্বোধন/বোকা
সিদা	সোজা
পান্তা	জল দেওয়া ভাত
ঢেমনী	উপপত্নী
সইন্ধা বেলাত	সন্ধ্যা বেলা

৩. 'গোধূলি'— নাট্যরূপ অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজবংশী ভাষাভুক্ত আঞ্চলিক শব্দাবলী	চলিত বাংলা ভাষা
ভাতার	স্বামী
সোয়ামীটো	স্বামীটা
মাগী/মাগিটাক	মেয়ে/মেয়েটাক
ইস্তিরিক	স্ত্রী
বেটিছাওয়া	কন্যা সন্তান
বাপ/বাপটা/বাপই	বাবা

রাজবংশী ভাষাভুক্ত আঞ্চলিক শব্দাবলী	চলিত বাংলা ভাষা
রেজিন	দিনমজুরি
ছিনাল	দরজাল/চরিত্রহীন
গতর খাটা/গাওগতরে	শরীর দিয়ে পরিশ্রম করা
কামাই	উপার্জন
ভাতের খোটা	ভাতের ভর্ৎসান/গঞ্জনা
কাজিয়া	ঝগড়া ঝাটি/গণ্ডগোল
ওই থানে	ঐ কারণে
ঢলাঢলি	লোক হাসহাসি
মাচান/মাচং	বাঁশের জাঙ্গি
কুণ্ডমন্দিত	কুশমণ্ডি
হুস	জ্ঞান
দেমাক	অহঙ্কার
সরম/শরম	লজ্জা
বিমারি/ব্যামারি	রোগ
কিষাণ	কৃষক
পুছ/পুছেন	জিজ্ঞাসা
বেচি	বিক্রয় করি
দরমা	মজুরি/বেতন
গোসা	ক্ষোভ/রাগ
ঠেকা	দায়
বিন্ধাই দিমো	প্রবেশ করে দেওয়া
মিছাই	মিথ্যা
ধান্দা	উপায়
বেয়াড়া	খারাপ/মন্দ
বেয়াদপ	অশিষ্ট/অসভ্য
পিটালেন	মারলেন
অহিস	থাম
সুহাগ	আদর
গাঁও/গাত্তৎ/গাওয়ত	গ্রামে

জন পাইট	জন মজুর/সাধারণ শ্রমিক
মুখ চাগাড় দিছে	মুখ বেড়ে উঠেছে
বিপাকে	বিপদে
তামাম	সব
মুক্ষুসুক্ষু	মূর্খ
ফোম	জ্ঞান
সোমথ	সামর্থ
খেমতা/ ক্ষ্যামতা	ক্ষমতা
ছালনি	ছাল/খোলস

তথ্যসূত্র:

১. পবিত্র সরকার - 'নাট্যমঞ্চ নাট্যরূপ' ১ম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, দে'জ সংস্করণ: মার্চ ২০০৮, পৃ. ৪১৯

২. ড. সুভাষচন্দ্র রায়চৌধুরী - 'পশ্চিম দিনাজপুর জেলার উপভাষা', দাশগুপ্ত এণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জন্মাষ্টমী, ১৩৯৫, পৃ. ৩৮, ৩৯, ৪০

৩. দেবাশীষ ভৌমিক - 'উপভাষা : মিশ্রণ ও বিলুপ্তি', কলকাতা, অর্পিতা, ২০০৮, পৃ. ১০

৪. ড. সুভাষচন্দ্র রায়চৌধুরী - 'পশ্চিম দিনাজপুর জেলার উপভাষা: একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা, মধুপর্ণী, সম্পাদক অজিতেশ ভট্টাচার্য পঞ্চবিংশ বর্ষ, বিশেষ পশ্চিম দিনাজপুর জেলা সংখ্যা-১৩৯৯, পৃ. ১৯২

৫. ড. সুকুমার সেন - 'ভাষার ইতিবৃত্ত' ইস্টার্ন পাবলিসার্স, কলকাতা-৯, পঞ্চদশ সংস্করণ-১৯৮৭, পৃ. ১৯০

৬. ড. নির্মল দাশ - 'উত্তরবঙ্গের ভাষা প্রসঙ্গ', সাহিত্য বিহার, কলকাতা-৯, পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ: অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ১৮

৭. ড. সুকুমার সেন - 'ভাষার ইতিবৃত্ত', পৃ.২৩০, ২৩৩ এবং ড. সুভাষচন্দ্র রায়চৌধুরী 'পশ্চিমদিনাজপুর জেলার উপভাষা', পৃ. ৩৯

৮. ড. সুভাষচন্দ্র রায়চৌধুরী - 'পশ্চিমদিনাজপুর জেলার উপভাষা', পৃ. ৪০

৯. ড. নির্মল দাস - 'উত্তরবঙ্গের ভাষা প্রসঙ্গ', পৃ. ১৫

১০. ত্রিতীর্থ নাট্যসংস্থার রেজিস্টার বুক থেকে প্রাপ্ত, ত্রিতীর্থ বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর।